Dhruba Chand Halder College

Study Material on Environemntal Studies

CVAC - Environmental Studies (University of Calcutta)

Semester - II

Name of the Coordinators

Dr. Subodh Sahoo

Dr. Mobina Parveen

Dipankar Roy

Abisekh Subba

Dr. Bratati Dey

Syllabus

Unit – 1 – Environmental Education
Unit – 2 – Rules and Regulations of Environment
Unit – 3 – Human communities and the Environment
Unit – 4 – Disaster Awareness
Unit – 5 – Role of Environmental Education in Protecting Environment

Book Reference

Poribesh Bidya by Rajarshi Mitra and Moumita Roy Goswami by Progressive Publisher.

Environmental Studies, Publisher University of Calcutta.

			মূল উপপাদ্য। অংশগ্রহণকারী দেশগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান মেনে চলার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়।
কিয়োটো প্রোটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (Kyoto Protocol)	১৯৯৭	কিয়োটো, জাপান	বিশ্ব উষ্ণায়নের এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান নিমিত্ত সর্বসম্মত রূপরেখা প্রস্তুতকরণ।
প্যারিস এগ্রিমেন্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ	২০১৫	প্যারিস	বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান নিমিত্ত সর্বসম্মত চুক্তিগুলি পুনর্মূল্যায়ন এবং পরিমার্জিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পরিবেশবিদ্যা ও তার ব্যাপ্তি

পরিবেশবিদ্যা, পরিবেশের বিভিন্ন অংশ বা ঘটনা, যা কিনা পরিবেশের ভিন্নতর আঙ্গিকগুলিকে, বিশেষত জীবপ্রজাতিকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করে

থাকে। পরিবেশ মূলত ভৌতপ্রকৃতি, জীবগোষ্ঠী এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এই তিনটি ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। ফলে এদের কোনো একটির ক্ষয় বা অসাম্য সামগ্রিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের কোনো আঙ্গিক বা পরিবর্তনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, যে কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করলেই হবে না, বরং ভূবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আরো অনেক বিশেষ বিশেষ প্রকারের তথ্যের সমন্বয়সাধন করা জরুরি। সেই কারণেই পরিবেশবিদ্যা একটি মৌলিক বিষয়ের বদলে একটি প্রয়োগভিত্তিক বহুমুখী বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

মনে করা যাক, কোনো একটি অঞ্চলের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি নথি বানানোর প্রয়োজন। একটি অঞ্চল মানে তাতে অরণ্য, জলাভূমি, ছোটো ছোটো গ্রাম বা শহরাঞ্চল, টিলা, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভূমির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আবার, ওই অঞ্চলে জলের ব্যবহার বা আবহাওয়ার সম্পর্কে ধারণা করতে হলে, সেখানকার বায়ুপ্রবাহ, জলের উৎস ইত্যাদি সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। এরূপ অবস্থায়, দেখা যায় বিভিন্ন বিষয় যেমন ভূগোল, ভূবিদ্যা, বাস্তুরীতি, জীববিদ্যা, আবহাওয়া বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবিকা ও জীবনধারণের প্রকার সম্পর্কে তথ্য না থাকলে, আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাবগুলি সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে এখানেই নৃতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন এই সকল বিষয়গুলি তাদের অবদান রাখে। বহুবিষয়ক প্রয়োগমূলক পরিবেশবিদ্যাই তাই সুস্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) পদ্ধতি হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। অন্যভাবে দেখতে গেলে, কোনো একটি বিশেষ বিষয় অধ্যয়নের সময়, সেই বিষয়ের সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যও পরিবেশবিদ্যার মতো প্রয়োগমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি জরুরি। আর এখানেই বিষয়টির ব্যাপ্তি বোঝা যায়।

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির কথা মাথায় রাখলে দেখা যাবে, এর বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার জন্য রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। যেমন বায়ুর গতিপ্রকৃতি, ঝড় বা তুফানের সৃষ্টি ইত্যাদি তাপগতিবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রকে অনুসরণ করে থাকে। আবার নানা প্রকারের প্রদূষকের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়াসমূহ ঘটে রসায়নের নিয়ম অনুসারে। অপরদিকে পৃথিবীর জলস্তর, শিলাস্তর বা ভূমিরূপের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভূবিদ্যা ও ভূগোলের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি।

ভূপৃষ্ঠের সকল উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধক জীবকুলের স্বভাব, গতিবিধি ও তাদের উপর পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জানার বা কাজ করার জন্য প্রয়োজন জীববিদ্যার জ্ঞান। প্রদূষকের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব বা বিষক্রিয়া সংক্রান্ত অবস্থা নির্ণয়নের জন্য শারীরবৃত্তি ও বিষবিদ্যার জ্ঞান জরুরি। অবশেষে, সামগ্রিক পরিবেশের আসল চালিকাশক্তি বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে

বর্তমান পরিবেশ পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারী মানবসমাজের কর্মধারা সম্পর্কে জানার ও তার সঠিক নির্দেশের রূপায়ণের জন্য সমাজবিদ্যা, আইনবিদ্যা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এইভাবেই পরিবেশবিদ্যা একটি বহুমুখী বিষয় হিসেবে পরিচিতি ও বিস্তার লাভ করে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ নৈতিকতা ও আন্দোলন
Environmental Ethics and Movement

মানবসমাজ নিজেদের বাঁচার তাগিতে ক্রমাগত পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত থাকে। একটু নজর করলে দেখা যায় প্রায় সবক্ষেত্রেই মানব সামাজিক এই ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতির ক্ষতি বা ক্ষয় সাধন করে থাকে, অর্থাৎ আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ আহরণে রত থাকি। কিন্তু এই সম্পদ আহরণের কিছু ক্ষেত্রে তা জীবনধারনের প্রশ্নে জরুরি হয়ে ওঠে আবার কিছু ক্ষেত্রে তা আরও সুখ, আরও ঐশ্বর্যের জন্য হয়। ফলে পরিবেশের উচিত এবং অনুচিত ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা ঘটায়।

পরিবেশ নৈতিকতা এই প্রশ্নটি-র উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। অর্থাৎ পরিবেশ নৈতিকতা পরিবেশ আলোচনার এমন একটি প্রেক্ষিত, যা মানুষের কোনো একটি কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে সঠিক না বেঠিক সে বিষয় আলোচনা করে। যেমন একজন অরণ্যের অধিবাসী জীবনধারণের প্রয়োজনে গাছ কাটছে, আবার আর একজন ব্যবসা বা অতিরিক্ত আয় বা নিছক আনন্দের আতিশয্যে গাছ কাটছে, এই দুই প্রেক্ষিতে কার্যকলাপটি এক হলেও, কোন্ ক্ষেত্রে আমরা সেটিকে পরিবেশ ধ্বংসের একটা কারণ হিসেবে মনে করব, আর কোন্ ক্ষেত্রে করব না তা ঠিক হয় এই পরিবেশ নৈতিকতার দ্বারা। পরিবেশ নৈতিকতা বা যেকোনও তাত্ত্বিক নৈতিকতা এমন একটি বিষয়, যেখানে বহুক্ষেত্রেই আইনি ব্যবস্থার সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। যেমন উপরের উদাহরণটিতেই দেখা যায়, আইন অনুসারে দুটি ক্ষেত্রেই একই অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু যে মানুষটি শুধুমাত্র জীবনধারণের মৌলিক রসদ জোগাড় করার জন্য পরিবেশের সম্পদ ক্ষয় ঘটাচ্ছে তাকে পরিবেশ নৈতিকতার প্রশ্নে সহজেই ছাড় দেওয়া যায়। অপর দিকে বৈভবের চাহিদায় সেই একই কাজ করলে আইন এবং পরিবেশ নৈতিকতা কোনো বিচারেই তার কার্যকলাপ মেনে নেওয়া যায় না। আসলে এইখানেই পরিবেশবাদ (Environmentalism) এবং পরিবেশ নৈতিকতার (Environmental Ethics) তফাত। পরিবেশবাদে মানুষ নিজেদের পরিবেশের রক্ষক ও নির্ধারক হিসেবে কল্পনা করে এবং অপর সকল প্রকার জীবকুলকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য হিসেবে ধরে নেয়, সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেও যে ঐ একই তন্ত্রের অংশ তা মনে করে না। এই ধারণা প্রকৃতি কেন্দ্রিক (Non-anthropocentric or nature centric) নৈতিকতার অংশ। কিন্তু পরিবেশ নৈতিকতার প্রেক্ষিতে মানুষ নিজেদেরকেও পরিবেশের অংশ হিসেবে মনে করে এবং তাই কোনো কার্যকলাপকে সঠিক বা বেঠিক আখ্যা দেওয়ার আগে তার কারণ বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাগিদ দেখায়। এই ধারণা মানবকেন্দ্রিক (Anthropocentric) নৈতিকতার অংশ। অন্য সকল বিষয়ের মতোই পরিবেশ

নৈতিকতাও আবর্তিত হয়, ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) এবং জন রাওল (John Rawl) এই দুই নীতি দার্শনিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে। পরিবেশ নৈতিকতার প্রকারগুলি টেবিল ৯.১ তে আলোচিত হল—

টেবিল ৯.১ : কান্টীয় ও রাওলীয় পরিবেশ নৈতিকতার তুলনা

কান্টীয় পরিবেশ নৈতিকতা **Kantian Environmental ethics**	রাওলীয় পরিবেশ নৈতিকতা **Rawlian Environmental ethics**
ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতার ধারণা অনুসারে পরিবেশ নৈতিকতার এই প্রকারটি 'ডিউটি এথিক্স' নামেও পরিচিত। দর্শন শাস্ত্রের এই ধারা 'ডিয়ন্টোলজিক্যাল' (deontological) নৈতিকতা অনুসরণ করে।	জন রাওলের নৈতিকতার ধারণা মূলত ফলাফলভিত্তিক। এই প্রকার নৈতিকতা দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় কন্‌সিকোয়েলিস্টিক (Consequalistic ethics) নৈতিকতা নামে পরিচিত।
কান্টের মতানুসারে, পৃথিবীর সকল জীবকুল এবং অন্যান্য আঙ্গিক সমূহকে রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে সঠিক পদক্ষেপগুলি মেনে কার্য সম্পাদন করাই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। অর্থাৎ এই নৈতিকতা সঠিক চলার পথ নির্দেশ করে, শুধুমাত্র অন্তিম ফলাফলের উপর নির্ভরশীল নয়।	রাওলের মতানুসারে, কোনো প্রকার ক্রিয়াকলাপের অন্তিম ফলাফল মানুষ ও তার পরিবেশের সঠিক ও সার্বিক উন্নতি ঘটাতে বা সুষ্ঠ অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম কিনা তার উপর সেই কার্যের নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত সকল পদক্ষেপের নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা বিবেচিত হয় না।

পরিবেশ নৈতিকতা ও তাদের ব্যবহারিক দিকটির আলোচনা করার ক্ষেত্রে পরিবেশবিদ্‌রা দুটি বিশেষ প্রকার বাস্তুশাস্ত্র বা বাস্তুচিন্তার অবতারণা ঘটান। প্রথম প্রকারটি **গভীর বাস্তুশাস্ত্র (Deep ecology)** এবং দ্বিতীয় প্রকারটি **অগভীর বাস্তুশাস্ত্র (Shallow ecology)**। যদিও এই দুই প্রকার বাস্তুশাস্ত্র-ই পরিবেশ রক্ষার কথা বলে, কিন্তু ভাবনাগত দিক থেকে এই দুয়ের মূল্যবোধের বিস্তর ফারাক লক্ষণীয়।

গভীর বাস্তুশাস্ত্র বা (Deep Ecology)

১৯৭৩ সালে আরনে নিস (Arne Naess) নামক নরওয়ে নিবাসী এক দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্বত আরোহীর হাত ধরে এই গভীর বাস্তুশাস্ত্র তত্ত্বটি প্রথমবারের জন্য উত্থাপিত হয়। এই তত্ত্বের অনুসারীরা প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যগুলিকে গুরুত্বের সাথে বিচার্য মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষার কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের মতানুসারে পরিবেশের প্রতিটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র সেগুলি প্রকৃতিতে থাকার প্রয়োজন আছে তাই (internric or existence value)। এক্ষেত্রে সেই উপাদানগুলির সাথে মানব সভ্যতার বিকাশগত প্রয়োজনীয়তার কোনো সম্পর্ক থাকা বা না থাকার উপর তাদের সংরক্ষণ নির্ভর করে না।

Scanned by CamScanner

আইন কানুন প্রনয়ণ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিজস্ব আইন, কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রণীত আইন, আবার সারা পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নও করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি চুক্তি প্রণয়ন ও ঘোষণা প্রনয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবেশের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার চেস্টা করছে ও বিশ্বকে দূষণ মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে আইন প্রনয়ন করা হয়।

① পরিবেশের অপ্রীতিকর ক্ষতিকারক উপাদান নিয়ন্ত্রণ।
② বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে।
③ প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ।
④ লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষা।
⑤ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা।
⑥ অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করা।

2.25 পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম কানুন (Different Types of Rules and Regulation)

① জলদূষণ সংক্রান্ত আইন।
② বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন।
③ বিষাক্ত পদার্থ সংক্রান্ত আইন।
④ বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন।
⑤ বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972।
⑥ অরণ্য ভূমি সংরক্ষণ আইন, 1980।
⑦ জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, 1974।
⑧ বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, 1981।
⑨ পরিবেশ সুরক্ষা আইন, 1986।

2.26 জলবায়ু সংক্রান্ত পারস্পরিক আলোচনা (Climate Negotiations)

- **IPCC :** এর পুরো নাম হল Inter Governmental Panel on Climate Change।
- **WMO :** World Meteorological Organization।
- **UNEP :** United Nations Environment Programme যৌথ উদ্যোগে 1988 খ্রিস্টাব্দে IPCC স্থাপন করেছে। এর উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) :

1972 খ্রিস্টাব্দে স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 1992 খ্রিস্টাব্দে রিও-ডি-জেনিরোতে (Rio-de-Janeiro) পরিবেশ উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন নীতি ঘোষণা করা হয় যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ গ্রহণ করেছে। এর প্রধান নীতিগুলি হল—

① স্বাধীনতা, সমতা, উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান মর্যাদাসহ প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে।
② আগামী প্রজন্মের মানুষের কথা ভেবে পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
③ বাতাস, জল, স্থলভাগ, উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে।
④ মানুষের দায়িত্ব হল বন্যপ্রাণী ও তাদের বাসস্থান রক্ষা করা।

⑤ অপুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তা দ্রুত নিঃশেষিত না হয়।
⑥ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
⑦ দুষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে।
⑧ দূষণ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রই নীতিগতভাবে দূষণ রোধের সমস্ত খরচ বহন করবে।
⑨ মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
⑩ পরিবেশ সমস্যার সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হবে।
⑪ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূষণ প্রতিরোধের দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন।
⑫ পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার জন্য যুদ্ধ করার মনোভাব দূর করতে হবে।

1992 খ্রিস্টাব্দের 3 জুন থেকে 14 জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ব্রাজিলের 'রিও-ডি-জেনিরোতে' (Rio-de-Janeiro) আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য যে সম্মেলন করেছিলেন তা **'আর্থ সামিট'** বা **'বসুন্ধরা সম্মেলন'** নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে ভারত সহ পৃথিবীর মোট 130টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

'আর্থ সামিট'-এ—পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং তার নিয়ন্ত্রণের জন্য একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় ওই সম্মেলনের কর্মসূচিগুলি আমাদের দেশে 'এজেন্ডা-21' (Agenda-21) নামে পরিচিত। সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট (Sustainable Development) বা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক দীর্ঘমেয়াদি সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 'আর্থ সামিট'-এর একুশ দফা কর্মসূচি নিম্নরূপ—

① বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা।
② বনানীর বিলোপ স্থগিত করা।
③ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।
④ স্বাস্থ্যরক্ষায় সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
⑤ জনবসতি উন্নয়নের স্থিতিশীল বা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা।
⑥ জনগণের দারিদ্র্য দূর করা।
⑦ উন্নয়নশীল দেশগুলির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা।
⑧ জনসংখ্যা সম্পর্কিত স্থায়ী উন্নয়ন।
⑨ ভূমি সম্পদের সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
⑩ পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার।
⑪ ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা—মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধ ও খরার প্রতিরোধ।
⑫ পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা।
⑬ গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্থিতিশীল প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি ঘটানো।
⑭ সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা করা।
⑮ জলসম্পদ উন্নয়ন করা।
⑯ মানুষের ভোগের পরিবর্তন করা।
⑰ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন করা।
⑱ পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে বিষাক্ত বর্জ্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
⑲ বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের আন্তর্জাতিক পাচার বন্ধ করা।
⑳ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত বন্দোবস্ত করা।
㉑ দূষিত জল ও কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা।

এগুলি ছাড়াও সম্মেলনে পরিবেশসংক্রান্ত 27টি নীতি নির্ধারণ করা হয়। এই সম্মেলনে পৃথিবীর উন্নয়ন এবং উন্নত দেশগুলির মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের ব্যাপারে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্ক **'উত্তর-দক্ষিণ বিতর্ক'** বা **'নর্থ-স ডিবেট'** (North-South Debet) নামে পরিচিত।

▶ **UNFCCC :** পুরোনাম হল The United Nations Framework Convention on Climate Change। 1992 খ্রিস্টাব্দে 9 মে এই চুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছিল। 1994 খ্রিস্টাব্দে 21 মার্চ UNFCCC চুক্তি বলবৎ করা হয়। আলোচ্য চুক্তিতে 197টি দেশ অংশ নিয়েছিল।

▶ **উদ্দেশ্য (Objectives) :**

① পরিবেশের সুরক্ষা।

② বিশ্ব উষ্ণায়নের হার কমানো।

③ গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ।

2.27 CBD

▶ **পুরোনাম (Full form) :** কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি। বাংলাতে একে "জীববৈচিত্র্যের সম্মেলন" বলে।

▶ **ভূমিকা (Introduction) :** এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। রিয়ো-ডি-জেনিরো-তে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে 1992 খ্রিস্টাব্দে CBD চুক্তিটি প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছিল। চুক্তিটি বলবৎ হয়েছিল 1993 খ্রিস্টাব্দের 29 ডিসেম্বর। 193টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এর সদর দপ্তর কানাডার মন্ট্রিল শহরে।

▶ **উদ্দেশ্য (Objectives) :**

① জীববৈচিত্র্যের সুস্থায়ী উন্নয়ন।

② জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

③ জীবের জিনগত সম্পদের সব দেশে সমভাবে ব্যবহার।

▶ **ভারতের ভূমিকা (Responsibility of India or Role of India) :**

① 2002-2004 খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি (National Biodiversity Strategy and Action Plan—NBSAP)।

② ভারত 2006 খ্রিস্টাব্দে National Environment Policy তৈরি করেছে।

③ 2008 খ্রিস্টাব্দে National Biodiversity Action Plan—NBAP তৈরি করেছে।

④ 2012 খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদে 175টি দেশের কয়েক হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর নাম COP-11 (Eleventh Conference of Parties to the CBD)।

অনুশীলনী [Exercise]

A সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো — প্রশ্নের মান-1

1. ইকোসিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হল

a. বায়োমাস
b. শক্তিপ্রবাহ
c. পদার্থের চক্রাকার আবর্তন
d. a ও b উভয়ই — **Ans d**

2. নিম্নলিখিত কোন্‌টির দ্বারা খাদক স্তরে শক্তি সঞ্চয় হয়?

a. গৌণ উৎপাদন b. নেট উৎপাদন
c. মুখ্য নেট উৎপাদন d. a ও b উভয়ই — **Ans b**

3. জীবাশ্ম জ্বালানি প্রধানত যে দূষকের উৎস সেটি হল

a. নাইট্রিক অ্যাসিড b. নাইট্রাস অক্সাইড
c. নাইট্রোজেন অক্সাইড d. সালফার ডাইঅক্সাইড
Ans d

4. সংখ্যার পিরামিড সর্বদাই *[BU '17]*

a. ঊর্ধ্বমুখী b. মাকু আকৃতির
c. ওলটানো d. a ও b উভয়ই — **Ans a**

5. ইকোসিস্টেমের প্রধান উপাদান হল

a. খনিজের চক্রাকার আবর্তন ও শক্তি প্রবাহ
b. খাদ্যশৃঙ্খল ও শক্তি প্রবাহ
c. শক্তি প্রবাহ ও বিয়োজক
d. খাদ্যশৃঙ্খল ও বিয়োজক — **Ans d**

6. সংখ্যার পিরামিড গঠিত হয় *[BU '17]*

a. পুষ্টিস্তরের প্রতিটি সদস্য দ্বারা
b. গোষ্ঠীর উপপ্রজাতি দ্বারা
c. কোনো অঞ্চলের প্রজাতি দ্বারা
d. উপরের কোনোটিই নয় — **Ans a**

বর্জ্য পদার্থের উৎস (Sources of waste product) ঃ

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিস থেকে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য সৃষ্টি হয়। নীচে ছকের সাহায্যে তা দেখানো হল—

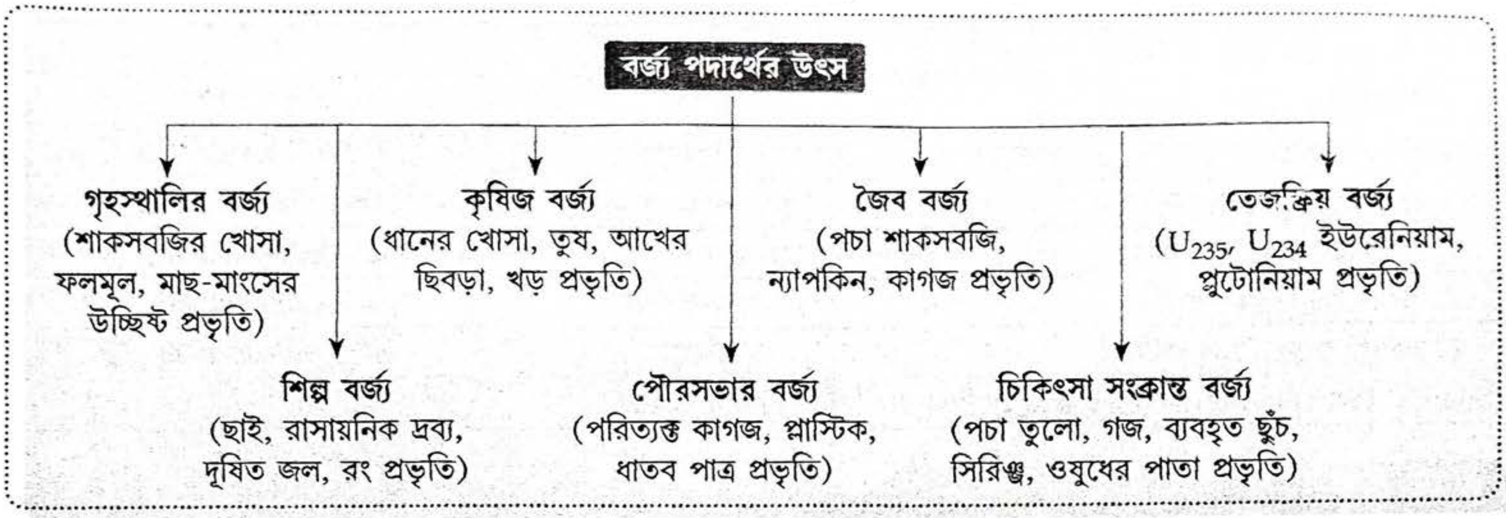

6.17 পরিবেশ আইন (Environmental Legislations)

পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু আইন বিধিবদ্ধ করা হয়, যা পরিবেশ আইন নামে পরিচিত।

ভারতীয় সংবিধানে পরিবেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম (Law of environmental protection in Indian constitution) ঃ

i. 48A ধারা ঃ ভারতীয় সংবিধানে 'রাজ্যশাসন প্রণালীর নির্দেশিকা নিয়ম' (*Directive Principles of State Policy*)-র 48A ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি রাষ্ট্র পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবে এবং দেশের অরণ্য ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ii. 51A ধারা ঃ ভারতীয় সংবিধানে Fundamentals Duties of Citizens 51A ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের প্রতিটি নাগরিক অরণ্য, হ্রদ, নদী, উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি সহ প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করবে এবং প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে।

বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ আইন (Different types of environmental legislations) ঃ

1. পরিবেশ সুরক্ষা আইন (Environmental Protection Act, 1986) ঃ 1986 খ্রিস্টাব্দের 23 মে ভারতীয় সংবিধানের 253নং ধারায় ভারত সরকার পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে। এই আইনটি 1972 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে স্টকহোম-এ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ সংক্রান্ত অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রণয়ন করা হয়।

• **পরিবেশ সুরক্ষা আইনের মূল উদ্দেশ্য ঃ** ① পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও তাদের কার্যকর করতে হবে। ② এই আইনের 3নং ধারা অনুসারে, কোনো দূষিত পদার্থের ব্যবহারের যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তার অতিরিক্ত উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও আমদানি-রপ্তানি করা যাবে না। ③ এই আইনের 7 নং ধারা অনুসারে, কোনো দূষিত পদার্থের যে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা কোনোভাবেই উলঙ্ঘন করা যাবে না। ④ পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো নীতি নির্ধারণ করতে পারবে। ⑤ পরিবেশ সংক্রান্ত যে-কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ করতে পারে। সেই ক্ষতিপূরণ পেতে সে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। ⑥ শিল্প স্থাপনের জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন, নিক্ষেপ, স্থান নির্বাচন প্রভৃতি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের জন্য সরকারের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ⑦ এই আইনের 15নং ধারায় বলা হয়েছে, পরিবেশ দূষণের সীমা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির 1 লক্ষ টাকা জরিমানা বা সর্বোচ্চ 5 বছরের

জন্য জেল বা জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে। ⑧ রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবেশ কল্যাণমূলক কাজে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হবে। ⑨ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত মান নির্ধারণ করা যাবে এবং বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। ⑩ এই আইন অনুযায়ী, সরকার ইচ্ছে মতো দূষণ সৃষ্টিকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করতে পারে বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ করতে পারে।

2. বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন (Wildlife Protection Act, 1972) : চোরাশিকারি ও অবৈধ শিকারের হাত থেকে বিপন্ন প্রজাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 1972 খ্রিস্টাব্দে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে।

● **বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের মূল বিষয় :** ① সমস্ত ধরনের বন্যপ্রাণী যেমন উভচর, পক্ষী, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ প্রভৃতি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। ② এই আইনের অন্তর্গত I, II, III, IV তফশিলে তালিকাভুক্ত প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি শিকার করা যাবে না। এদের জন্য পৃথক লাইসেন্স থাকতে হবে। ③ (a) বন্যপ্রাণী মানুষের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, (b) বন্যপ্রাণীর দ্বারা ফসলের ক্ষতি হলে, (c) বন্যপ্রাণী কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে, (d) কৃত্রিম প্রজননে ঘটানোর প্রয়োজন, (e) কোনো জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান—উপরোক্ত এই কারণগুলির জন্য শিকার করা যেতে পারে। ④ বন্যপ্রাণীর গায়ের ছাল, লোম, শিং দাঁত, নখ ইত্যাদি অনুমতি ছাড়া সংরক্ষণ করা যাবে না। ⑤ এই আইন লঙ্ঘনকারীর 3 বছরের কারাদণ্ড বা 25000 টাকা জরিমানা বা কারাদণ্ড ও জেল উভয়ই হতে পারে। ⑥ রাজ্য সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য State Wildlife Advisory Board বা বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করবে। ⑦ এই আইনের 3 নং তফশিল অনুযায়ী শিকারে নিষিদ্ধ প্রাণী হল বার্কিং হরিণ, নীলগাই, ভোঁদড়, চিতল, সম্বর, হায়না, হরিণ প্রভৃতি।

3. অরণ্য সংরক্ষণ আইন (Forest Conservation Act) : যথেচ্ছ হারে অরণ্যচ্ছেদন বন্ধ, চোরাশিকারের কার্যকলাপ বন্ধ, বনভূমি সংরক্ষণ অরণ্যের দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রস্তুত করার জন্য 1980 খ্রিস্টাব্দের 25 অক্টোবর অরণ্য সংরক্ষণ আইন চালু করা হয়। এই আইনটি 1988 খ্রিস্টাব্দে সংশোধন করে পুনরায় প্রণয়ন করা হয়।

● **অরণ্য সংরক্ষণ আইনের মূল বিষয় :** ① অরণ্য অঞ্চলকে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না এবং পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ② অরণ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেমন— যথেচ্ছ হারে বৃক্ষচ্ছেদন না করা, বনসৃজন করতে হবে, পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ③ স্থানীয় অধিবাসীদের পতিত জমিতে সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচি করতে হবে। ④ স্থানান্তর কৃষি ও অরণ্যের জমি অধিগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারি অনুমতিক্রমে কাজ করতে হবে। ⑤ স্থানীয় অধিবাসীদের পতিত জমিতে সামাজিক বনসৃজনের কর্মসূচি করতে হবে। ⑥ অরণ্যে উদ্যানকৃষি, রবার চাষ, ভেষজ উদ্ভিদ রোপণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বনভূমিকে ব্যবহার করতে হবে। তবে অরণ্য সংরক্ষণ করা যাবে। ⑦ এই আইনের নির্দেশাবলি লঙ্ঘন করলে 500 টাকা জরিমানা বা 6 মাসের জেল বা জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

4. জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Water Pollution Prevention and Control Act) : জলের অপচয় কমানো, জলদূষণ প্রতিরোধ করা, জলসম্পদের সংরক্ষণ, জল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে 1974 খ্রিস্টাব্দের 23 মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। 1988 খ্রিস্টাব্দে এই আইনটি পুনরায় সংশোধন করা হয়।

● **জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের মূল বিষয় :** ① এই আইনের 25 (i) (a) ধারা অনুযায়ী, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না, বিশেষত যেগুলি থেকে পুকুর, কুয়ো, নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ হতে পারে। ② এই আইনের 25 (i) (a), (b), (c) ধারা অনুযায়ী দূষণ পর্ষদের অনুমতি ব্যতীত কেউ তরল বা দূষিত বর্জ্য নিক্ষেপণ ও নির্গমনের জন্য নতুন পথ নির্মাণ করতে পারবে না বা পুরোনো পথও পরিবর্তন করতে পারবে না। ③ এই আইনের 41(1), (2), (3) ও C(i) ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি এই আইন অমান্য করলে সর্বাধিক 5000 টাকা জরিমানা বা সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড বা জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

5. বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (Air Pollution Prevention and Control Act) : বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 1981 খ্রিস্টাব্দের 29 মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেন।

● বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন-এর মূল বিষয় :

① কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করার পরেও সময় বিশেষে রাজ্যদূষণ পর্ষদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

② কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 16 নং ধারায় এবং রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 17 নং ধারায় কাজগুলি করা হয়েে
③ এই আইনের 21, 22, 24 এবং 50 নং ধারায় কিছু শিল্পসংস্থাকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনে আনা হয়েছে, সেগুলি হল (i) রাসায়নিক শিল্প, (ii) কয়লাভিত্তিক শিল্প, (iii) সিমেন্ট ও সিমেন্টজাত উৎপাদন শিল্প, (iv) অ্যাসবেসটস ও সামগ্রী শিল্প, (v) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, (vi) ঢালাই শিল্প, (vii) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, (viii) ধাতু নিস্কাশন শি (ix) বস্ত্রবয়ন শিল্প, (x) সেরামিক শিল্প প্রভৃতি।
④ এই আইনের 21 নং ধারা অনুযায়ী কোনো সংস্থা রাজ্য দূষণের পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোনো শিল্প স্থাপন কর৷ পারবে না।

6. শব্দদূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন (Sound Pollution Prevention and Control Pollution Ac 2000) : 1999 খ্রিস্টাব্দের 1 জুলাই কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন দফতর মন্ত্রকের উদ্যোগে সামাজিক স্থানে শব্দদূষণ রোধ কর উদ্দেশ্যে বিধিনিষেধের একটি খসড়া পেশ করা হয়, এটি 2000 খ্রিস্টাব্দের শব্দদূষণ আইন রূপে পার্লামেন্টে পেশ করা হয়

▶ **মূল বিষয় :** ① এই আইন অনুযায়ী কোনো এলাকায় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন ছাড়া লাউড স্পিকার বাজানে যাবে না, ② রাত্রি 10 টা থেকে সকাল 6 টায় কোনোভাবেই লাউড স্পিকারের ব্যবহার করা যাবে না। ③ শব্দদূষণমু অঞ্চলে কোনো প্রকার শব্দ হলে বা নিয়ম অমান্য করলে অম্যান্যকারীর ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে।

একনজরে

বনভূমি ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত :

- ভারতীয় বনভূমি আইন—1927 এবং সংশোধন 1984।
- বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) আইন—1927, সংশোধন 1983, 1986, 1991, 2002, 2006।
- বনভূমি রক্ষণ আইন—1980 এবং সংশোধন 1988।
- হস্তী সংরক্ষণ আইন—1879।
- বনভূমি(সংরক্ষণ)আইন,সংশোধিত1988খ্রিস্টাব্দে—1980।
- বন্য পক্ষী রক্ষণ আইন—1887।
- বন্যপক্ষী ও পশু রক্ষা আইন—1912।
- বঙ্গীয় গন্ডার সংরক্ষণ আইন—1932।
- ST ও অন্যান্য বংশপরম্পরায় বসবাসকারী অরণ্য অধিবাসী আইন (বন্য অধিকারের স্বীকৃতি/Recognition of Forest Rights)—2006।
- জীববৈচিত্র্য আইন—2002।
- বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির রক্ষণ ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার সংক্রান্ত আইন—2001।
- ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল আইন—2010।

বায়ুদূষণ সংক্রান্ত :

- বায়ু (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন—1981 এবং সংশোধন—1987।
- পরমাণু শক্তি আইন—1982।
- মোটরযান সংক্রান্ত আইন—1988।

জলদূষণ সংক্রান্ত :

- জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন—1974 এবং সংশোধিত 1988।
- জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন (Cess act)—1977 এবং সংশোধিত—1992, 2003।
- উপকূলবর্তী অঞ্চল সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিজ্ঞপ্তি 1991, সংশোধন—1994, 1986-এর পরিবেশ রক্ষণ আইন অনুসারে।

পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন :

- পরিবেশ রক্ষণ আইন—1986 এবং সংশোধিত 1991।
- বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন) নিয়মাবলি (rule) —1989।
- বিপজ্জনক রাসায়নিক উপাদান উৎপাদন, মজুত ও আমদানি সংক্রান্ত নিয়মাবলি (rule)— 1989।
- বিপজ্জনক আণুবীক্ষণিক প্রাণী। জীব প্রযুক্তিজাত প্রাণী অথবা কোশ ইত্যাদির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি-রপ্তানি ও মজুত সংক্রান্ত নিয়মাবলি (rule)—1989।
- লোকদায় বিমা আইন—1991।
- পরিবেশের ওপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি 1993, 1986-এর পরিবেশ রক্ষণ আইন অনুসারে, সংশোধন 1994, 1997।
- জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবিউনাল আইন—1995।
- রাসায়নিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আপৎকালীন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি (rule)—1996।
- বিপজ্জনক বর্জ্য ও রাসায়নিক সংক্রান্ত নিয়মাবলি (সংশোধনী) সংক্রান্ত নীতি (Rule) বা নিয়ম—1996।
- চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন) নীতি (rule)—1998।
- পৌরসভার কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ত নিয়মনীতি [ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (handling)]—20000।
- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আইন—2002।

অন্যান্য নিয়ম-নীতি :

- বনভূমি (সংরক্ষণ) নিয়ম — 2003।
- বনভূমি (সংরক্ষণ) নিয়ম — 1981, সংশোধিত 1992।
- চিড়িয়াখানা নিয়মের (rules) স্বীকৃতি— 1992, 2009।
- বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) নিয়ম— 1995।
- ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ম — 2003।
- বায়ু (রক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) সংক্রান্ত নিয়ম—1983।
- বায়ু (রক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সংক্রান্ত নিয়ম— 1982।
- জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি— 2004।

6.18 মন্ট্রিল প্রোটোকল ও কিয়োটো প্রোটোকল (Montreal Protocol and Kyoto Protocol)

▶ **মন্ট্রিল চুক্তি (1987 খ্রিস্টাব্দে) :** এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ওজোন ধ্বংসের জন্য দায়ী বিষাক্ত দূষকগুলি চিহ্নিত করা ও তা নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 44টি রাষ্ট্র এই চুক্তি অনুমোদন করে এবং ওজোন ধ্বংসকারী দূষক উৎপাদন বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ রাখায় রাজি হয়।

▶ **কিয়োটো চুক্তি বা কিয়োটো থার্মাল ট্রিটি (1997 খ্রিস্টাব্দে) :** এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্ব উষ্ণায়নে কারণ ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। এই সম্মেলনে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিমাটো বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে গ্রিনহাউস উৎপাদন কমানোর জন্য আবেদন রেখেছিলেন। এই সম্মেলনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর অঙ্গীকার করে।

একনজরে

- **স্টকহোম সম্মেলন (1972 খ্রিস্টাব্দে) :** প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সুসংহত ব্যবহার করতে হবে। অপুনর্ভব সম্পদের ব্যবহার কমাতে হবে। উন্নত দেশগুলি, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করবে এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘ অর্থসাহায্য করবে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা যেন আন্তর্জাতিক দূষণকে ছাড়িয়ে না যায় তা লক্ষ রাখা।
- **বার্লিন ম্যান্ডেট বা বার্লিন ক্লাইমেট সামিট (1995 খ্রিস্টাব্দে) :** এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল—এই সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি CFC ও হ্যালোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে। এই চুক্তিতে উন্নত দেশগুলিকে CFC ও হ্যালোন গ্যাস নির্গমনের ঊর্ধ্বসীমা ঠিক করে দেওয়া হয়।
- **জোহানেসবার্গ সম্মেলন (2002 খ্রিস্টাব্দে) :** 2002 খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে স্থিতিশীল উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে 110 জনের বেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও 50 হাজার প্রতিনিধি ও সদস্য এবং প্রচুর বেসরকারি সংগঠন উপস্থিত ছিল। এই সম্মেলনে দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি, বিশ্বায়ণ, পরিস্রুত পানীয় জলের বিষয়গুলিও আলোচনায় এসেছিল।

6.19 জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত সম্মেলন (Convention of Biological Diversity)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 1992 খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলে রিও-ডি-জেনেরিও শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এটি বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) নামে পরিচিত। Convention of Biological Diversity বসুন্ধরা সম্মেলনে প্রস্তাবিত একটি চুক্তি। 1992 খ্রিস্টাব্দের 5 জুন 168টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং 1993 খ্রিস্টাব্দের 29 ডিসেম্বর এটি কার্যকরী হয়।

আলোচিত বিষয় (Discussed matter) :

এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলি হল—সিসা, গ্যাসোলিন ও তেজস্ক্রিয় রাসায়নিকের উৎপাদনের ওপর পর্যবেক্ষণ করা। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বাড়ানো। পৃথিবীব্যাপী পানীয় ও পরিশুদ্ধ জলের ঘাটতি পূরণ করা। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও মরুকরণ রোধ করা। বর্তমানে 193টি দেশ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎকে রক্ষার উদ্দেশ্যে Convention of Biological Diversity (CBD) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ নৈতিকতা ও আন্দোলন
Environmental Ethics and Movement

মানবসমাজ নিজেদের বাঁচার তাগিতে ক্রমাগত পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত থাকে। একটু নজর করলে দেখা যায় প্রায় সবক্ষেত্রেই মানব সামাজিক এই ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতির ক্ষতি বা ক্ষয় সাধন করে থাকে, অর্থাৎ আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ আহরণে রত থাকি। কিন্তু এই সম্পদ আহরণের কিছু ক্ষেত্রে তা জীবনধারনের প্রশ্নে জরুরি হয়ে ওঠে আবার কিছু ক্ষেত্রে তা আরও সুখ, আরও ঐশ্বর্যের জন্য হয়। ফলে পরিবেশের উচিত এবং অনুচিত ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা ঘটায়।

পরিবেশ নৈতিকতা এই প্রশ্নটি-র উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। অর্থাৎ পরিবেশ নৈতিকতা পরিবেশ আলোচনার এমন একটি প্রেক্ষিত, যা মানুষের কোনো একটি কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে সঠিক না বেঠিক সে বিষয় আলোচনা করে। যেমন একজন অরণ্যের অধিবাসী জীবনধারণের প্রয়োজনে গাছ কাটছে, আবার আর একজন ব্যক্তি বা অতিরিক্ত আয় বা নিছক আনন্দের আতিশয্যে গাছ কাটছে, এই দুই প্রেক্ষিতে কার্যকলাপটি এক হলেও, কোন্ ক্ষেত্রে আমরা সেটিকে পরিবেশ ধ্বংসের একটা কারণ হিসেবে মনে করব, আর কোন্ ক্ষেত্রে করব না তা ঠিক হয় এই পরিবেশ নৈতিকতার দ্বারা। পরিবেশ নৈতিকতা বা যেকোনও তাত্ত্বিক নৈতিকতা এমন একটি বিষয়, যেখানে বহুক্ষেত্রেই আইনি ব্যবস্থার সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। যেমন উপরের উদাহরণটিতেই দেখা যায়, আইন অনুসারে দুটি ক্ষেত্রেই একই অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু যে মানুষটি শুধুমাত্র জীবনধারণের মৌলিক রসদ জোগাড় করার জন্য পরিবেশের সম্পদ ক্ষয় ঘটাচ্ছে তাকে পরিবেশ নৈতিকতার প্রশ্নে সহজেই ছাড় দেওয়া যায়। অপর দিকে বৈভবের চাহিদায় সেই একই কাজ করলে আইন এবং পরিবেশ নৈতিকতা কোনো বিচারেই তার কার্যকলাপ মেনে নেওয়া যায় না। আসলে এইখানেই পরিবেশবাদ (Environmentalism) এবং পরিবেশ নৈতিকতার (Environmental Ethics) তফাত। পরিবেশবাদে মানুষ নিজেদের পরিবেশের রক্ষক ও নির্ধারক হিসেবে কল্পনা করে এবং অপর সকল প্রকার জীবকুলকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য হিসেবে ধরে নেয়, সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেও যে ঐ একই তন্ত্রের অংশ তা মনে করে না। এই ধারণা প্রকৃতি কেন্দ্রিক (Non-anthropocentric or nature centric) নৈতিকতার অংশ। কিন্তু পরিবেশ নৈতিকতার প্রেক্ষিতে মানুষ নিজেদেরকেও পরিবেশের অংশ হিসেবে মনে করে এবং তাই কোনো কার্যকলাপকে সঠিক বা বেঠিক আখ্যা দেওয়ার আগে তার কারণ বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাগিদ দেখায়। এই ধারণা মানবকেন্দ্রিক (Anthropocentric) নৈতিকতার অংশ। অন্য সকল বিষয়ের মতোই পরিবেশ

নৈতিকতাও আবর্তিত হয়, ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) এবং জন রাওল (John Rawl) এই দুই নীতি দার্শনিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে। পরিবেশ নৈতিকতার প্রকারগুলি টেবিল ৯.১ তে আলোচিত হল—

টেবিল ৯.১ : কান্টীয় ও রাওলীয় পরিবেশ নৈতিকতার তুলনা

কান্টীয় পরিবেশ নৈতিকতা **Kantian Environmental ethics**	রাওলীয় পরিবেশ নৈতিকতা **Rawlian Environmental ethics**
ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতার ধারণা অনুসারে পরিবেশ নৈতিকতার এই প্রকারটি 'ডিউটি এথিক্স' নামেও পরিচিত। দর্শন শাস্ত্রের এই ধারা 'ডিয়ন্টোলজিক্যাল' (deontological) নৈতিকতা অনুসরণ করে।	জন রাওলের নৈতিকতার ধারণা মূলত ফলাফলভিত্তিক। এই প্রকার নৈতিকতা দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় কন্‌সিকোয়েলিস্টিক (Consequalistic ethics) নৈতিকতা নামে পরিচিত।
কান্টের মতানুসারে, পৃথিবীর সকল জীবকুল এবং অন্যান্য আঙ্গিক সমূহকে রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে সঠিক পদক্ষেপগুলি মেনে কার্য সম্পাদন করাই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। অর্থাৎ এই নৈতিকতা সঠিক চলার পথ নির্দেশ করে, শুধুমাত্র অন্তিম ফলাফলের উপর নির্ভরশীল নয়।	রাওলের মতানুসারে, কোনো প্রকার ক্রিয়াকলাপের অন্তিম ফলাফল মানুষ ও তার পরিবেশের সঠিক ও সার্বিক উন্নতি ঘটাতে বা সুষ্ঠ অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম কিনা তার উপর সেই কার্যের নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত সকল পদক্ষেপের নীতিগত গ্রহণযোগ্যতা বিবেচিত হয় না।

পরিবেশ নৈতিকতা ও তাদের ব্যবহারিক দিকটির আলোচনা করার ক্ষেত্রে পরিবেশবিদরা দুটি বিশেষ প্রকার বাস্তুশাস্ত্র বা বাস্তুচিন্তার অবতারণা ঘটান। প্রথম প্রকারটি **গভীর বাস্তুশাস্ত্র (Deep ecology)** এবং দ্বিতীয় প্রকারটি **অগভীর বাস্তুশাস্ত্র (Shallow ecology)**। যদিও এই দুই প্রকার বাস্তুশাস্ত্র-ই পরিবেশ রক্ষার কথা বলে, কিন্তু ভাবনাগত দিক থেকে এই দুয়ের মূল্যবোধের বিস্তর ফারাক লক্ষণীয়।

গভীর বাস্তুশাস্ত্র বা (Deep Ecology)

১৯৭৩ সালে আরনে নিস (Arne Naess) নামক নরওয়ে নিবাসী এক দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্বত আরোহীর হাত ধরে এই গভীর বাস্তুশাস্ত্র তত্ত্বটি প্রথমবারের জন্য উত্থাপিত হয়। এই তত্ত্বের অনুসারীরা প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যগুলিকে গুরুত্বের সাথে বিচার্য মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষার কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের মতানুসারে পরিবেশের প্রতিটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র সেগুলি প্রকৃতিতে থাকার প্রয়োজন আছে তাই (internric or existence value)। এক্ষেত্রে সেই উপাদানগুলির সাথে মানব সভ্যতার বিকাশগত প্রয়োজনীয়তার কোনো সম্পর্ক থাকা বা না থাকার উপর তাদের সংরক্ষণ নির্ভর করে না।

স্বাভাবিক ভাবেই এই বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী প্রাকৃতিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপিত হয় উপাদানগুলির সংরক্ষণের উপর এবং এই সকল উপাদানের সম্পদ মূল্য বা অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক মূল্যসমূহ মূলত অস্বীকার করা হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই শাস্ত্র শিল্প উন্নয়ন, নগরপত্তন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিপন্থী। তবে, এই শাস্ত্র আবার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে মান্যতা দেয়, ফলে প্রকৃতিকেন্দ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথিকৃৎ বা মূলভিত্তি হিসেবে গভীর বাস্তুশাস্ত্র কাজ করে।

অগভীর বাস্তুশাস্ত্র (Shallow Ecology)

পরিবেশ রক্ষার মূল তাগিদ তৈরি হয়েছিল পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়, দূষণ ও ধ্বংসলীলাকে প্রত্যক্ষ করে। পরিবেশে এই সকল ক্ষয় বা প্রদূষণ সমূহ পক্ষান্তরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিপন্থী। ফলে পরিবেশের ব্যবহারিক মূল্যগুলিকে আহরণ করার উদ্দেশ্যে বা প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পরিবেশের সংরক্ষণ জরুরি। এই ভাবধারার পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রকৃতি রক্ষায় যে আন্দোলন তা অগভীর বাস্তুশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। এই চিন্তাধারা অনুসারে যেহেতু পরিবেশ রক্ষা নিরবচ্ছিন্ন সম্পদ আহরণের একটি পদ্ধতি অনুসারে পরিগণিত হয়, তাই এক্ষেত্রে পরিবেশের সম্পদমূল্য বা অস্তিত্বের মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হয় না এবং স্বাভাবিক নিয়মেই স্থানীয় বা অরণ্যের অধিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকারের দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই ভাবধারা ফলাফল ভিত্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং প্রকৃতিকে শুধুমাত্র সম্পদের আধার হিসেবেই সংরক্ষণ করে থাকে।

পরিবেশবাদ (Environmentalism)

বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ নৈতিকতা বা সচেতনতার ফলস্বরূপ পরিবেশ রক্ষার যে পথ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় গ্রহণ করে তা সাধারণ অর্থে পরিবেশবাদ বা এনভারনমেন্টালিজ্ম নামে পরিচিত। কিন্তু পরিবেশবাদ আসলে একটি বিশেষ প্রকার সমাজ বা প্রকৃতি দর্শন যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার উদ্‌বর্তনের চেতনা থেকে উদ্ভূত। পরিবেশ রক্ষার এই চেতনার কর্মপদ্ধতির রকমফেরে পরিবেশবাদেরও প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। কান্টীয় বা রাওলীয়, গভীর বা অগভীর যে প্রকার নৈতিকতাই মূলে থাকুক, সকল ক্ষেত্রেই এই দর্শন পরিবেশ রক্ষা করে থাকে।

সাধারণত, পরিবেশবাদ তিনটি প্রকার বা বর্ণের বলে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

হালকা সবুজ পরিবেশবাদ (Light Green Environmentalism)

হালকা সবুজ পরিবেশবাদ অনুসারে মানুষ তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, জীবনযাপনের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশ রক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ এই প্রকার পরিবেশবাদ

ব্যক্তিগত স্তরে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলে। এই নীতি বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষ যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রকৃতিবান্ধব সামগ্রীর ব্যবহার, সঠিক পদ্ধতিতে আবর্জনার নিষ্কাশন, বুদ্ধি এবং পরিমিত উপায়ে শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি অভ্যাস করে তাহলে সামগ্রিক পরিবেশের সংরক্ষণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ হালকা সবুজ নীতিতে পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা হিসেবে মনে করা হয়।

উজ্জ্বল সবুজ পরিবেশবাদ (Bright Green Environmentalism)

কিছু পরিবেশবাদী মানুষ বা সংগঠনের ধারণা অনুসারে সামাজিক ব্যবহারিক প্রজ্ঞা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের সঠিক সমন্বয়ই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বোত্তম উপায়। এই প্রকার চিন্তাশীলতা উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের পরিবেশবাদ হিসেবে সমাদৃত। এই পদ্ধতিতে একাধারে সামাজিক প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটায় পরিবেশ রক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধিও দ্রুত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থে এই পরিবেশবাদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে হালকা সবুজ নীতির অনুপস্থিতি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্তরের সচেতনা ব্যতিরেকে এই প্রকার পরিবেশবাদের সাফল্য সম্ভব নয়।

গাঢ় সবুজ পরিবেশবাদ (Dark Green Environmentalism)

গাঢ় সবুজ পরিবেশবাদের ধারণা অনুসারে, একটা সামগ্রিক বিশ্বব্যাপী বা অন্তত দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না করা গেলে, ছোটো ছোটো অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ করে পরিবেশের সামগ্রিক রক্ষা বা উদ্বর্তন সম্ভব নয়। এই প্রকার পরিবেশবাদ, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নীতিগত আমূল পরিবর্তনের (radical change) পক্ষে। ফলে এর সাফল্য সময়সাপেক্ষ এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল।

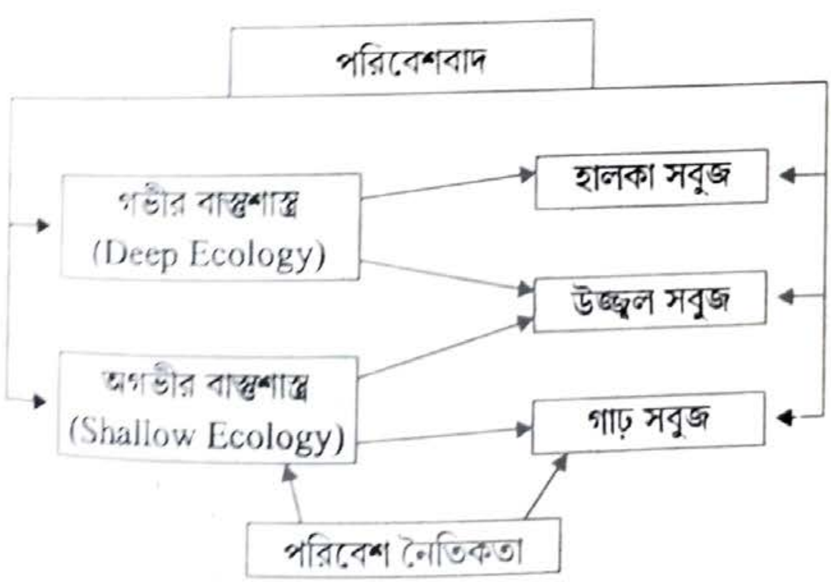

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশের দূষণ ও ক্ষয় বৃদ্ধির সমান্তরালে বেড়েছে মানুষের বিপন্নতা। আর এই বিপন্নতার থেকে জন্ম নিয়েছে পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার মানসিকতা। ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশবাদের বিভিন্ন প্রকার, পরিবেশ নৈতিকতার বিভিন্ন স্তর। আর তার সাথেই জন্ম নিয়েছে বিরোধ। কখনো পরিবেশের অবস্থার উদ্বর্তন আবার কখনো নিজেদের বিপন্নতা হ্রাসের প্রয়োজনে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংগঠিত হয়েছে পরিবেশ আন্দোলন। ভারতবর্ষেও এর ব্যক্তিক্রম হয়নি।

পরিবেশ আন্দোলন

পরিবেশ নৈতিকতা, পরিবেশবাদ এবং উন্নয়নবাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো মতান্তর না থাকলেও বিভিন্ন সময় মানুষ নিজেদের প্রয়োজন, মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিবেশের উপর আঘাত হেনেছে, আর সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত বা বিরোধিতা করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে একের পর এক পরিবেশ আন্দোলন। সেই আন্দোলন কখনো যেমন একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের রক্ষার জন্য হয়েছে, কখনো বা সংঘটিত হয়েছে বিশাল সংখ্যক মানুষের বাস্তুভিটা রক্ষার জন্য। আবার শান্তিপূর্ণ বা বিরোধিতাহীন আন্দোলনের নজিরও কম নয়। বিরোধহীন আন্দোলনগুলি মূলত সংঘটিত হয়েছে পরিবেশ ও তার সম্পদগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার বা সঠিক পথে ব্যবহারের জন্য। যেমন, রাজস্থানের আলোয়ার জেলায় জোহাড় আন্দোলন বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পথ দেখিয়েছে সভ্যতাকে যা জলসম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ব্যবহারের পথিকৃৎ।

ভারতবর্ষে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা বহুবছর পূর্বে ১৭০০ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের হাত ধরে। পরবর্তী পর্যায়, চিপকো আন্দোলন, অ্যাপ্পিকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও শহর কেন্দ্রিক কিছু আন্দোলন যেমন দিল্লি শহরে CNG প্রবর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণোই আন্দোলন

১৭৩০ সালে অরণ্য রক্ষার জন্য রক্তক্ষয়ী এক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সম্ভবত ভারতবর্ষে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা। রাজস্থান প্রদেশের একটি জনজাতি বিষ্ণোই সম্প্রদায়, পরিবেশ এবং সকল প্রকার জীব সম্প্রদায়কে অত্যন্ত পবিত্র এবং সেই সকল জীবকুলের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। এহেন বিষ্ণোই সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নয়নের স্বার্থে ও তদানীন্তন রাজার আদেশে বৃক্ষচ্ছেদন শুরু হলে, গ্রামের এক মহিলা অমৃতা দেবীর নেতৃত্বে বহুসংখ্যাক বিষ্ণোই মানুষ প্রতিবাদ করেন। গাছ রক্ষার তাগিদে এক একজন এক একটি গাছ জড়িয়ে ধরে তা কাটতে বাধা দেয়। ফলস্বরূপ রাজপেয়াদাদের অস্ত্রের ঘায় ৩৬৩ জন বিষ্ণোই-র প্রাণ যায়। এই বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা সামনে আসায়, রাজা নিজে গ্রামে এসে বৃক্ষচ্ছেদনের আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং বিষ্ণোই অধ্যুষিত অঞ্চলে জীবহত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে ঐ অঞ্চলকে একটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নত করেন।

সেই ঘটনার প্রায় তিনশো বছর পর আজও ওই অঞ্চল সংরক্ষিত আছে। তার সাথে সংরক্ষিত আছে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের অতিপ্রিয় কৃষ্ণসার মৃগদের প্রজাতি এবং সাম্রাজ্য। আঞ্চলিক বাস্তুতন্ত্র এবং কৃষ্ণসার মৃগ (Black buck) প্রজাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে সারা পৃথিবীতে আজ বিষ্ণোই সম্প্রদায় একটি পরিবেশ বান্ধব সম্প্রদায় হিসেবে বহুল সমাদৃত।

চিপকো আন্দোলন

১৯৭০-এর দশকে অধুনা উত্তরাখণ্ড রাজ্যের তেহরি গাড়োয়াল জেলার সুন্দরলাল বহুগুণা নামক এক জননেতার নেতৃত্বে গড়ে উঠে এই আন্দোলন। সুন্দরলাল বহুগুণা এবং চণ্ডীপ্রসাদ ভাট এই দুই পরিবেশপ্রেমী মানুষ তেহরি গাড়োয়ালের সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রচার করেন। তাঁরা মানুষকে বোঝান ভূমির উর্বরতা এবং গঠন সংরক্ষণে বৃক্ষের অবদানের কথা। বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমি ধ্বসের প্রবণতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে বৃক্ষের ভূমিকা। এই সচেতনতা প্রসার কালক্রমে এক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং উন্নয়নের হিড়িকে বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ রক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন এক অগ্রণী ভূমিকা নেয়। স্থানীয় মানুষ বিশেষত মহিলারা বৃক্ষরাজিকে জড়িয়ে ধরে এবং বৃক্ষের গায়ে সুতো বেঁধে তাদের রক্ষা করার অঙ্গীকার করায় এই আন্দোলন চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। ১৯৭৮ সালে 'আদবানী' গ্রামের মহিলারা এই আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পুলিশের গুলি ও নানা প্রকার অত্যাচারের মুখেও নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে অবশেষে জয় লাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে 'চিপকো আন্দোলন' ছিল অরণ্যের অধিকারের আন্দোলন, অর্থাৎ স্থানীয় অরণ্য সম্পদ এবং বৃক্ষরাজির উপর স্থানীয় বাসিন্দাদের যে দাবি তা রক্ষা করার এক আন্দোলন। এবং ১৯৮০-র দশক থেকে এই আন্দোলনের রূপরেখাই হয়ে ওঠে ভারতবর্ষে পরিবেশমুখী উন্নয়ন বা ইকো-ডেভেলপমেন্টের পথিকৃত।

সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

কেরালার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ (KSEB) ১৯৭৮ সালে কেরালার পালাক্কড় জেলায় ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যময় উপত্যকা সাইলেন্ট ভ্যালিতে কুন্তিপুঝা বা কুন্তি নদীর উপর বাঁধ দিয়ে একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা করে এবং ভারতের পরিকল্পনা তার অনুমতিও প্রদান করে।

এই প্রকল্পের জন্য যে রিজার্ভার তৈরির কথা ছিল তা প্রায় ৮ বর্গ কিমি অঞ্চলের অরণ্য ধ্বংস করতে পারত। এই কারণে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) নামক একটি অ-সরকারি সংগঠন (NGO) তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং জনমত তৈরি করে। এই প্রতিবাদ অচিরে এক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। এবং শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষা বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে জীববৈচিত্র্যের রক্ষার তাগিদে আরও অনেক সংস্থা এই

আন্দোলনে যোগদান করে। অবশেষে ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে একটি কমিটি আন্দোলনকারীদের দাবি খতিয়ে দেখতে শুরু করে। ১৯৮৩ সালে এই প্রকল্প বাতিল ঘোষিত হয়। বর্তমানে জীববৈচিত্র্যের নিরিখে ঐ বনাঞ্চল একটি সংরক্ষিত বনভূমি শুধু নয়, UNESCO একে 'World Heritage Site' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অ্যাপ্পিকো আন্দোলন

১৯৮৩ সালে কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া ও শিমোগা জেলায় চিপকো আন্দোলনের ধাঁচেই আর একটি আন্দোলন তৈরি হয় যা অ্যাপ্পিকো আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের নেতা হিসেবে পানটুরং হেগড়ের নাম বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সাধারণ মানুষের আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা নগণ্য।

১৯৫০ দশক থেকে ঐ দুই জঙ্গলাবৃত্ত জেলায় নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বহু বনাঞ্চল ধ্বংস হয় এবং প্রচুর অরণ্য অধিবাসী তাদের রুজি রোজগার হারায়। পরবর্তী সময় চিপকো আন্দোলনের থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরাই এই আন্দোলন গড়ে তোলে এবং বৃক্ষচ্ছেদন রুখে দেয়।

পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের থেকেই স্থানীয়ভাবে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারের প্রচার শুরু হয়। যেমন কাঠ বা কাগজ জ্বালানির পরিবর্তে গোবর গ্যাস বা বায়োগ্যাস ব্যবহারের প্রচারও শুরু হয় এই আন্দোলনের থেকেই।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

ভারতবর্ষে পরিবেশ আন্দোলনের তালিকায় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন একটি সুপরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম, যদিও এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি এক্ষেত্রে একটি গৌণ প্রেক্ষিত।

১৯৮০ দশকে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের খরাপ্রবণ অঞ্চলে জলের বণ্টনের কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার 'নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প' বা 'নর্মদা ভ্যালি প্রজেক্ট' নামে একটি জল সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাতে অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হয়। জলসেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এই প্রকল্পটিতে প্রায় ৩২০০টি নদী বাঁধ (ড্যাম) তৈরির পরিকল্পনা ছিল যার মধ্যে প্রায় ৩০টি বৃহদাকার। এরমধ্যে প্রথম দুটি বৃহৎ ড্যাম 'সরদার সরোবর প্রকল্প' এবং 'নর্মদা সাগর প্রকল্পের' রূপায়ণ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। এই দুটি বাঁধ নির্মাণের জন্যই দেখা যায় প্রায় ১,৮০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ভিটেমাটি হারিয়ে বা কাজ হারিয়ে। কিন্তু সরকারি ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন সেই তুলনায় যথেষ্ট কম। এই কারণে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৯০ দশকের গোড়ায় এই বিক্ষিপ্ত আন্দোলন বা বিক্ষোভগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে সমাজ কর্মী 'মেধা পাটেকর', এক সুবৃহৎ আন্দোলন শুরু করেন যা 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলন যেমন সামাজিক সমস্যাগুলির ভিতের উপর দাঁড়ায় সে রকমই এতে যোগ হয় পরিবেশগত সমস্যাগুলিও। জমি বা রুজি হারানোর সাথে সাথে বহুল পরিমাণে বনভূমিও জলের তলায় চলে যাবে এবং তাতে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি অপূরণীয়। এই সকল কারণে, ১৯৯৩ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের অর্থ সাহায্য বন্ধ করার কথা জানায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে ২০০০ সালে ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট সরকারের পক্ষে অর্থাৎ প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেন, কারণ তাঁদের মতে এতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ লাভবান হবে। ফলে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এক প্রকার ব্যর্থ হয়। ২০১৮ সালে 'সরদার সরোবর প্রকল্পটি' চালু হয়েছে।

পরিবেশ শিক্ষা

মানুষ ছোটো থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার পরিবেশের মধ্যে। পরিবেশ থেকেই সে তার জীবন ধারনের যাবতীয় রসদ আহরণ করে, কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষা অর্জিত হয় অপ্রথাগত উপায়। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশ সচেতনতার বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশ শিক্ষাও একটি বিশেষ শিক্ষণ প্রকার হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করছে।

পোশাকি ভাবে বলতে গেলে পরিবেশ শিক্ষা বলতে এমন এক শিক্ষণ পদ্ধতিকে বোঝায় যা পরিবেশকে বোঝা, তার সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র নির্ণয় করা এবং তদনুযায়ী সেই পরিবেশগত সমস্যার সমাধান ও পরিবেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনে মানুষ বা মানব সমাজকে সাহায্য করে।

মার্কিন পরিবেশ সংস্থা, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির (EPA) মতানুসারে পরিবেশ শিক্ষা মূলত পাঁচটি কার্যকলপের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে থাকে।

১. সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা (**Awarness & sensibility**) বৃদ্ধি, যা বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ বিপন্নতা ও তার প্রভাব সম্পর্কে মানব সমাজকে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
২. জ্ঞান এবং বোধশীলতা (**Knowledge and understanding**) বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশের বিপন্নতা বা বিপদগ্রস্ততা সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করা যা পরবর্তী পর্যায়ে কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করবে।
৩. মনোভাব (**Attitude**)-এর উন্মেষ ঘটানো, যা ব্যক্তিকে পরিবেশের উন্নতিকল্পে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।
৪. কর্মকুশলতা (**Skill**) বৃদ্ধি, যা প্রকৃত অর্থে পরিবেশগত সমস্যাগুলির সামনাসামনি হয়ে তাদের মোকাবিলা করার কারিগরি সহায়তা বা প্রযুক্তি ও প্রজ্ঞাগত প্রয়োগ করতে সহায়ক হবে।

৫. অংশীদারিত্ব (Participation) চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি বেশি সংখ্যক মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় ব্রতী করতে পারলে সংরক্ষণ অনেক বেশি কার্যকরী হয়। অংশীদারিত্ব চেতনা বৃদ্ধি হলে মানুষ পরিবেশের প্রতি যে একাত্মবোধ অর্জন করে, তা তাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যা এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ শিক্ষার উপরোক্ত কার্যাবলিকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে দুই প্রকার প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, প্রথাগত শিক্ষা ও অপ্রথাগত শিক্ষা।

প্রথাগত শিক্ষা ঃ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সংগঠিত শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশবিদ্যা বা পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে পড়ে। ভারতবর্ষে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বর্তমানে প্রথাগত শিক্ষার সকল স্তরের পাঠক্রমে পরিবেশবিদ্যার আবশ্যিক অন্তর্ভুক্তির কারণে, এই দেশে প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার দিকটি যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ বিজ্ঞান বা পরিবেশবিদ্যার বিশেষ পাঠক্রম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

অপ্রথাগত শিক্ষা ঃ পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে, অপ্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিগুলির অবদান ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এলাকাভিত্তিক পোস্টারিং, নেচার ক্যাম্প আয়োজন, প্রকৃতি পাঠের আসর, সচেতনতা শিবির, পথ নাটিকা, পরিবেশ সংক্রান্ত জাঠা আয়োজন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয় চয়ন ইত্যাদি মূলত অপ্রথাগত শিক্ষার বিকাশ ঘটায়। অপ্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসরকারি সংগঠনগুলির (NGO) ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে WWF, CSE, ATREE, BNHS ইত্যাদি সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সংবাদ মাধ্যমগুলিরও অপ্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই মাধ্যম সঠিক এবং সময়োচিত শিক্ষাবিস্তারে কার্যকরী।

নমুনা প্রশ্ন সম্ভার

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারগুলি আলোচনা কর।
২. পরিবেশ নীতি...

অষ্টম অধ্যায়

পরিবেশ বিপর্যয় ও মোকাবিলা
Environmental Disaster and Disaster Management

প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত যে কোনো ঘটনার মাত্রা যদি ব্যাপকতা লাভ করে এবং যদি তার কারণে প্রভূত পরিমাণে জীবকুলের ক্ষতি, সম্পত্তি এবং প্রাণহানি ঘটে তখন তাকে বলে বিপর্যয়। অর্থাৎ যদি কোনো একটি মরু অঞ্চলে প্রবল ভূমিকম্প ঘটে, কিন্তু জনবসতির অনুপস্থিতি এবং জীববৈচিত্র্যের অভাবের কারণে সামান্য ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন ব্যতীত আর কোনো ক্ষতি সাধিত না হয় তবে তাকে বিপর্যয় আখ্যা দেওয়া হয় না। অপরদিকে, ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে সামান্য মাত্রার কোনো ভূমিকম্পও প্রভূত প্রাণহানি ও সম্পত্তি হানি ঘটানোর ফলে তা বিপর্যয়রূপে পরিগণিত হয়।

সাধারণ শ্রেণিবিন্যাসের নিরিখে বিপর্যয়গুলিকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যজনিত, এই দুইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। তবে পরিবেশের মতো একটি অতি জটিল এবং উন্মুক্ত তন্ত্রের ক্ষেত্রে বিপর্যয়গুলির এই অতি সরলীকৃত প্রাকৃতিক (Natural) এবং মনুষ্যজনিত (Anthropogenic) শ্রেণিবিন্যাসটি কার্যকরী হয় না। সেদিক থেকে বিপর্যয়গুলিকে তাদের প্রকৃতির নিরিখে মূলত চারটি ভাগে, যথা ভূপ্রাকৃতিক (Geological disaster), জলবিষয়ক (Hydrological), জলবায়ু সংক্রান্ত (Climatic)

চার্ট ৮.১ : পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রকারভেদ

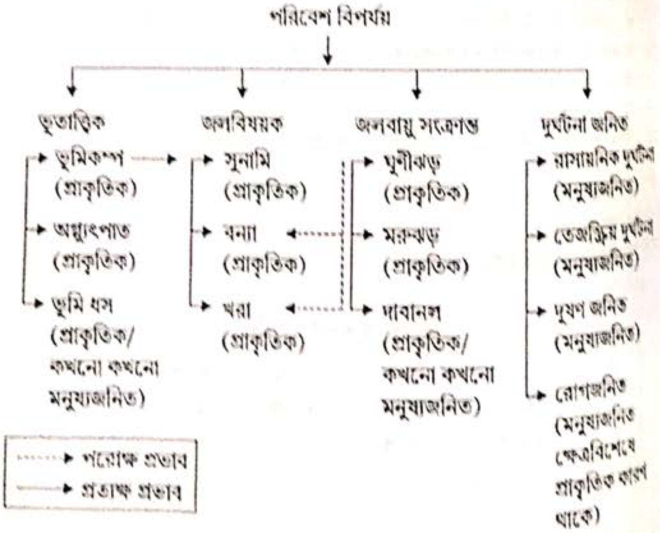

এবং দুর্ঘটনাজনিত (Accidental disaster) বিপর্যয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। এরমধ্যে দুর্ঘটনাজনিত বিপর্যয় ছাড়া বাকি সবকটি প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এইগুলির পিছনে মনুষ্যজনিত কারণ নিহিত থাকতেই পারে।

যেমন ভূমিধস একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেও, বহুক্ষেত্রে দেখা যায় পাহাড়ের ঢালে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ বা দুর্বল ভূত্বকীয় অংশের উপর বৃহদাকার জলাধার সৃষ্টির কারণে বা বেশিমাত্রায় কম্পনের কারণে ভূমিধস ঘটে। সেখানে ভূমিধসের পরোক্ষ কারণ হিসেবে মনুষ্যজনিত প্রভাবগুলিকেই মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

আবার দাবানলের মতো বিপর্যয় সরাসরি প্রাকৃতিক বা মনুষ্যজনিত হতে পারে। সুনামি হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে সম্পত্তি ও প্রাণহানি প্রতিরোধ করা যায়। ফলে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভবপর হয়ে থাকে।

ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় (Geologocial Hazards / Disaster)

পৃথিবীর ভূমিরূপ বা অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে সকল বিপর্যয় সংগঠিত হয় সেগুলিকে বলে ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ের বিবরণ ও ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হল।

ভূমিকম্প : ভূগর্ভস্থ গঠনের তারতম্যের জন্য বা টেক্টনিক প্লেটগুলির চলন সংক্রান্ত সংঘর্ষ, অথবা অপর কোনো কারণ যেমন বিস্ফোরণ, বৃহৎ ভূমিধস, উল্কাপাত ইত্যাদি, সামগ্রিকভাবে বা স্থানীয় পর্যায়ে ভূগর্ভের কম্পন সৃষ্টি করে থাকে। এই কম্পনের ফলে মুক্ত শক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছলে ভূত্বকে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ভূমিকম্প। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে টেকটনিক প্লেটগুলির নিরবচ্ছিন্ন সরণের কারণে বা বিভিন্ন প্রকার শক্তির মুক্তির কারণে সবসময়ই ভূপৃষ্ঠে সামান্য কম্পন অনুভূত হয়, তবে এই কম্পনের মাত্রা ৪ **রিখ্টার স্কেলের** (ভূকম্প পরিমাপক মান) থেকে বেশি হলে তাকে ভূমিকম্প বলে। রিখ্টার স্কেলের এক একক বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ১০০ গুণ বেশি কম্পন মাত্রা নির্দেশ করে। ফলে ৫.৫ বা ৬.০ রিখ্টার স্কেলের মাত্রার ভূমিকম্প বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভূকম্প হিসেবে পরিগণিত হয়। ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্রটির নাম 'সিসমোগ্রাফ'।

ভূগর্ভের অভ্যন্তরের যে বিন্দুতে দুটি প্লেটের সংঘর্ষ বা অন্য কোনো কারণে শক্তির মুক্তি ঘটে অর্থাৎ যেখানে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, সেই বিন্দুকে বলে **'ফোকাস'** বা **'হাইপোসেন্টার'**। অপরদিকে হাইপোসেন্টারের সরাসরি উপরে অর্থাৎ হাইপোসেন্টারের সাথে উলম্বভাবে ভূপৃষ্ঠের যে বিন্দু অধিষ্ঠান করে তাকে বলে **'এপিসেন্টার'**। উলম্বভাবে থাকায় এপিসেন্টারটি হাইপোসেন্টারের সবচেয়ে কাছের ভূপৃষ্ঠীয় বিন্দু এবং কম্পন সর্বপ্রথম এই বিন্দুটিতেই পৌঁছতে পারে। সেই কারণে 'এপিসেন্টার'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই কেন্দ্র থেকেই অতঃপর ভূকম্পের ভূপৃষ্ঠীয় প্রসারণ ঘটে, যা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

Scanned by CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

মানব সমাজ ও পরিবেশ
Population and Environment

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ দূষণ এই দুই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, সম্পদের অতিব্যবহার এবং তৎসংলগ্ন বর্জ্যপদার্থের নিঃষ্কাশনই পরিবেশের সকল প্রকার বিপন্নতার কারণ। স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি একাধারে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি ও পরিবেশে বর্জ্য নিষ্কাশনের হার বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশগত ক্ষয় বা পরিবেশের উপর চাহিদা, প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্টি বা পুনর্নবীকরণের হারের থেকে কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশের কোনো স্থায়ী ক্ষতি বা পরিবর্তন ঘটে না। এই সীমাটিকে বলে **'ধারণ ক্ষমতা'**, কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ বা পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি চাহিদার চাপ বর্তমান বিপন্নতার সৃষ্টি করেছে। অতএব বলা যায় পরিবেশ বিপন্নতার আঙ্গিকগুলি বিভিন্ন হলেও তাদের মূল-কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

আজ থেকে বহুবছর আগে মানুষ প্রথম যখন তাদের শিকার নির্ভর যাযাবর জীবন ছেড়ে বসতি স্থাপন করে, কৃষিকার্যের প্রবর্তন হয়, তারপর থেকেই তাদের জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেতে তাকে, আর তার সাথে বাড়তে থাকে জীবন ধারণের চাহিদা মিটে যাওয়ার পরেও হাতে থাকা অবসর সময়। জীবনের সুনিশ্চয়তা প্রাপ্তির সাথে সাথে উচ্চ জন্মহার ও হ্রাসপ্রাপ্ত মৃত্যু হারের কারণে শুরু হয় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

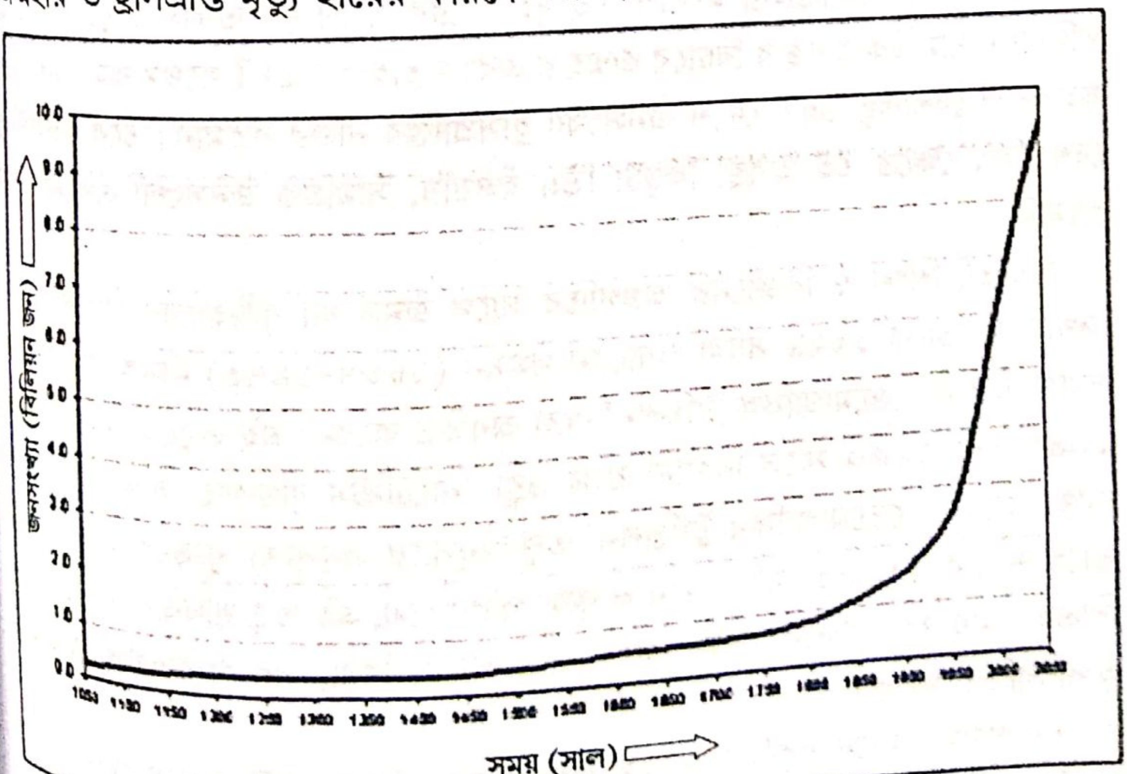

চিত্র ৭.১ ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি

Scanned by CamScanner

আজ থেকে ১২০০০ বছর আগে পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটির মধ্যে। কোনো কোনো মত অনুসারে হয়তো বা সেই সংখ্যা কৃষিকাজের গোড়াপত্তনের সাথে সাথে বেড়ে হয় ৫ কোটি, যা ১৮০০ সালে ১০০ কোটি, ১৯৬০ সালে ৩০০ কোটি এবং বর্তমানে বেড়ে ৮০০ কোটি হয়েছে (মারটেক ও সহযোগী ২০১৮)। এটা লক্ষণীয় যে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০ বছর থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত (প্রায় ১২০০০ বছরে) যেখানে জনসংখ্যা মাত্র ২০ গুণ বৃদ্ধি পায় সেখানে তৎপরবর্তী মাত্র ২০০ বছরে বৃদ্ধির হার ৮ গুণ, এবং আরো ভালোভাবে বলতে গেলে বিগত ৫০ বছরে সেই বৃদ্ধির হার ২.৫ গুণের থেকে বেশি।

এইভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেব অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা প্রায় ১০০০ কোটিতে (৯৮০ কোটি) পৌছবে, যা পৃথিবীর স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। জনসংখ্যা ও তার পরিবর্তন মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, জন্মহার এবং মৃত্যুহার। জন্ম এবং মৃত্যুর হারের নির্দিষ্ট সমন্বয়ের উপরই পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভরশীল—

$$\text{বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার} = \frac{[\text{জন্মহার-মৃত্যুহার}]}{১০০০} \times ১০০$$

সভ্যতার উন্নতির সাথে, শিক্ষার প্রসার এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির কারণে জন্ম এবং মৃত্যুহারে ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এমনকি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও এই দুই হারের গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আছে। বর্তমান পৃথিবীতে সামগ্রিক অবস্থার বিচারে জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই যথেষ্ট কম, এবং এর ফলস্বরূপ বেশকিছু উন্নত দেশে জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্তির নজির বর্তমান। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এই অবস্থা কিছুটা ভিন্ন হওয়ায়, সামগ্রিক জনসংখ্যা এখনো ক্রম বর্ধমান।

সভ্যতা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাকে ১৯২৯ সালে ওয়ারেন থম্‌সন (১৮৮৭-১৯৭৩) নামক এক মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী 'ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন' বলে অবহিত করেন। এই তত্ত্বকে পরবর্তীকালে ১৯৪০ এবং ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ডব্ল্যু নোটেস্টিন যুক্তিগ্রাহ্য রূপ প্রদান করে ব্যাখ্যা করেন। **'ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন'** তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদিও স্থান ও কাল পরিবর্তনে, এই তত্ত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় যা আঙ্গিকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু, এর পর্যায়গুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

এর প্রথম পর্যায়ে প্রকৃতির নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই অত্যন্ত বেশি থাকায় সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি অত্যন্ত ধীর হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ, প্রাকৃতিক

দুর্যোগ, প্রসূতী ও নবজাতকের মৃত্যু ইত্যাদি মৃত্যুহারকে খুব বেশি রাখায়, জন্মহার বেশি হলেও সামগ্রিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না।

দ্বিতীয় পর্যায়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার অগ্রগতি মানব সমাজকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, শিক্ষা ও সচেতনতা জনস্বাস্থের উন্নতি ঘটিয়ে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান রোগজনিত মৃত্যুর হার, নবজাতক ও প্রসূতী মৃত্যুহার কমিয়ে **'সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল'** বা **'লাইফ এক্সপেক্টেন্সি'** বৃদ্ধি করে। এর ফলস্বরূপ জন্মহার অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও, মৃত্যু হারে ব্যাপক হ্রাসের কারণে জনসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি হয়।

এর পরবর্তী পর্যায়, শিক্ষা-সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা, নগর সভ্যতার প্রসার এবং তৎসংলগ্ন জীবনযাত্রার পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে জন্মহারে দ্রুত হ্রাস ঘটায়। এর ফলে এই পর্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের পর্যায়ের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পায়, এবং একটা সুস্থিত অবস্থার দিকে যেতে থাকে।

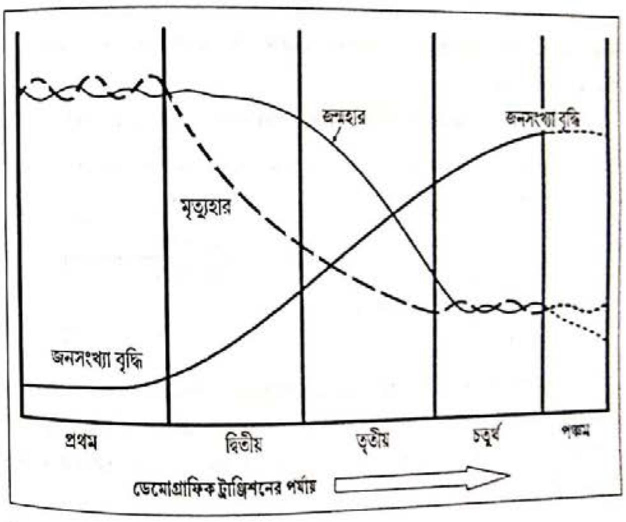

চিত্র ৭.২ : ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন

পরবর্তী চতুর্থ পর্যায়, জন্মহার আরও কমতে থাকে এবং মৃত্যুহার একটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখে বা অতিধীর গতিতে কমতে থাকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিপর্যয়

Scanned by CamScanner

মোকাবিলায় কার্যকারিতা বৃদ্ধির কারণে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও খুব কমে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা ঋণাত্মক হারে পরিণত হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যা হ্রাস ঘটে। কিছু দেশ যেমন জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে।

আপাত ভাবে সঠিক মনে হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঋণাত্মক গতি, অর্থাৎ যখন জন্মহার মৃত্যু হারের থেকে কম হয়, দেশের অর্থনীতি বা সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপন্থী। এই অবস্থাকে বলে 'ডিক্লাইনিং জনসংখ্যা'। প্রকৃতির নিয়মেই দেখা যায় মৃত্যুহার অপরিবর্তিত থাকলেও, পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম ও শেষ পর্যায়ে জন্মহারের সামান্য বৃদ্ধি ঘটে এবং ঋণাত্মক অগ্রগতির বদলে জনসংখ্যা একটা স্থিতাবস্থা লাভ করে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের শেষ পর্যায় থাকলেও, সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে ভারতবর্ষ যা পৃথিবীর মাত্র ২.৪% জমির অধিকারী, তা ১৭.৭১% জনসংখ্যা বহন করে। ভারতের মোট ১৩৭,১১,৭০৮৫২ বা ১৩৭ কোটি মানুষ মাত্র ৩২.৮৭ লক্ষ বর্গ কিমি জমিতে বসবাস করে, যার অর্থ প্রতি বর্গ কিমিতে ৪১৬ জন মানুষের বাস। তবে মনে রাখতে হবে, এই জমি ভারতের সকল জঙ্গল, পাহাড় ও অবসবাসযোগ্য অঞ্চল নিয়েও জরিপ করা হয়, ফলে প্রকৃতপক্ষে বাসযোগ্য অঞ্চলে আরও অনেক বেশি জনঘনত্ব দেখা যায়।

টেবিল ৭.১ ঃ ভারতের বিভিন্ন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

শহর	জনসংখ্যা (২০১১)	জন ঘনত্ব (জন/বর্গ কিমি)
মুম্বাই	১২৪৭৮৪৪৭	২২৯৩৭
দিল্লি	১১০৩৪৫৫৫	১১২৯৭
কোলকাতা	৪৪৯৬৬৯৪	২৪৩০৬
হায়দ্রাবাদ	৩৯৪৩৩২৩	১৮১৭২
বেঙ্গালুরু	৮৪৪৩৬৭৫	৪৩৭৮

জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি হবে এবং সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করার প্রচেষ্টায় পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ ও তাদের গুণগত মানের অবক্ষয় ঘটবে, যা অপরিবর্তনীয়।

ফলে বলা যেতে পারে পূর্ববর্তী 'প্রাকৃতিক সম্পদ' বা 'পরিবেশ দূষণ' অধ্যায়গুলিতে পরিবেশের যে সকল বিপন্নতার কথা আলোচিত হয়েছে, তার প্রায় সবটার মূলেই আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। পরবর্তী পর্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলত প্রত্যক্ষ ফলাফল বা পরিবেশগত প্রভাবগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহ

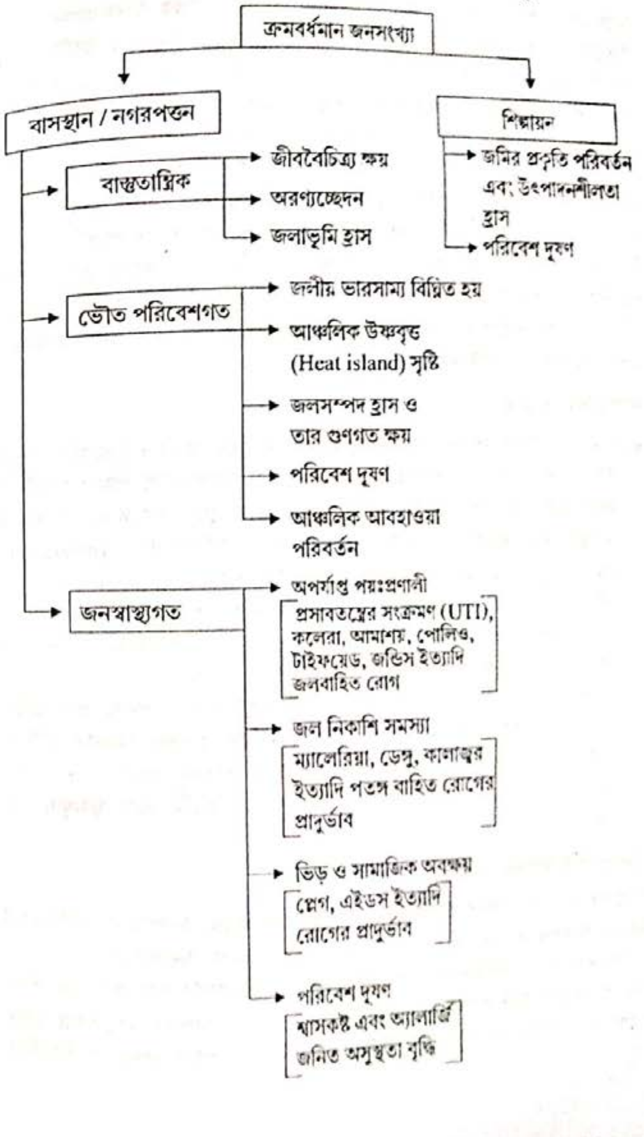

পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রভাব

আজ থেকে প্রায় ১২০০০ বছর আগে মানুষ তাদের যাযাবর জীবনযাপন ছেড়ে, বাসস্থান এবং তৎসংলগ্ন চাষজমি নিয়ে নিজের নিজের গোষ্ঠী অনুসারে ছোটো ছোটো গ্রাম বা হ্যামলেট গঠন করে। বাসস্থান বা কৃষিজমির সন্ধানে স্থানীয়ভাবে অরণ্যচ্ছেদন এবং অন্যান্য জীবজন্তু বা উদ্ভিদরাজির বাসস্থান (Habitat) ধ্বংসের সেই শুরু।

পরবর্তী পর্যায় ধীরে ধীরে গ্রাম গঠন এবং তারপর নগরায়ণ শুরু হয়, যা আজকের নগর সভ্যতার আদিরূপ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর (৩৩০০ খ্রিস্টপূর্ব) আগের সিন্ধু সভ্যতার যে নগর সভ্যতার উল্লেখ আমরা হরপ্পা (৩৩০০ খ্রিস্টপূর্ব) এবং মহেঞ্জোদারো (২৬০০ খ্রিস্টপূর্ব) শহরের ক্ষেত্রে পাই তা অনেকাংশে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর ছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিগত কয়েক শতাব্দীতে যে প্রকার নগর উন্নয়ন দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষেই পরিবেশের পরিপন্থী। বর্তমান নগরায়ণ পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক, বাস্তুতান্ত্রিক এবং জনস্বাস্থ্যগত কাঠামোর উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করছে।

বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাব

- গ্রাম বা নগর পত্তনের জন্য প্রয়োজন ভূমি, এবং তার জন্য ধ্বংস হয় প্রাকৃতিক সবুজ এবং বনভূমি। স্বাভাবিক ভাবেই এই সবুজ ধ্বংসের সাথে সাথে আমরা হারাই বহু জীববৈচিত্র্য। অপরদিকে সবুজ প্রকৃতির ধ্বংসের কারণে জীবজন্তু হারায় তাদের বাসস্থান এবং স্বাভাবিক দৈনিক বিচরণ ও বার্ষিক অভিপ্রয়াণের (migration) প্রয়োজনীয় পথ (corridor), যা পক্ষান্তরে প্রজাতিকুলের বিপন্নতা বৃদ্ধি করে। বনাঞ্চল হ্রাসের ফলে পৃথিবীর কার্বন ডাই-অক্সাইডের শোধন হার কমে যাওয়ায় বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক প্রতিকার অকার্যকরী হয়ে পড়ে এবং বিশ্বউষ্ণায়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও তা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

  ভূমির প্রয়োজনে জলাভূমি ধ্বংস করার ফলে শহরের বর্জ্য পদার্থ এবং জলীয় বর্জ্যের স্বাভাবিক বিয়োজন বিঘ্নিত হয়, জল নিকাশি ব্যবস্থার অবনতি ঘটে যা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনস্বার্থ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলাভূমি ও বনভূমিকে যথাক্রমে পরিবেশের **'কিড্‌নি'** এবং **'ফুসফুস'** বলা হয়।

ভৌত পরিবেশগত প্রভাব

উদ্ভিদাদি একাধারে যেমন বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করে, অপরদিকে পরিবেশের তাপীয় সঞ্চালন ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শহরাঞ্চলে বা বেশি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে মসৃণ, হালকা বর্ণের এবং প্রতিফলনযোগ্য তলের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায়, সূর্যালোক বেশি প্রতিফলিত হয়, কিন্তু উলম্ব অংশ, যেমন বাড়ির দেওয়াল বেশি থাকায় সেই প্রতিফলিত আলোকশক্তি বা তজ্জনিত উৎপাদিত তাপশক্তি পরিবেশের ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে ছোটো ছোটো তপ্ত অঞ্চল সৃষ্টি করে, যার পোশাকি নাম 'আরবান হিট্ আইল্যান্ড' (Urban Heat Island)। হিট আইল্যান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় হল বাধাপ্রাপ্ত তাপীয় সঞ্চালন, শহরাঞ্চলের বাসস্থানের ঘনত্ব এবং ক্রমাগত তাপবর্জন, বায়ুপ্রবাহকে প্রভাবিত করে বায়ুমণ্ডলীয় তাপীয় সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে আঞ্চলিকভাবে আবহাওয়ার, বিশেষত তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

জনসংখ্যার সাথে জলসম্পদের ব্যবহার সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি হয়ে থাকে, ফলত নগরাঞ্চলে জলসম্পদের দ্রুত হ্রাস ঘটতে থাকে। উপর্যুপরি, পরিবেশ দূষণ বা জলদূষণের পরিমাণ বেশি হওয়ায় জলসম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

অবশেষে, নগরায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাবটি হল পরিবেশ দূষণ। সবুজ উদ্ভিদের হ্রাস, তাপীয় সঞ্চালনের পরিবর্তনের সাথে যানবাহনের ধোঁয়া, মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য, জলীয় বর্জ্য নিঃসরণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রের থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষক পদার্থ সমূহ, একত্রিত ভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটায়, যার স্থানীয়, আঞ্চলিক বা বিশ্বব্যাপী প্রভাব সামগ্রিকভাবে প্রকৃতির এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্ষতিসাধন করে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত

নগরায়ণের ফলে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথা প্রতি উপলব্ধ স্থান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যা মানুষের মানসিক স্বাস্থের পক্ষে উদ্বেগজনক ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া নিকাশি ব্যবস্থার অবনমন, পরিবেশ দূষণ, পয়ঃপ্রণালীর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক সমস্যার বা রোগ সৃষ্টি করে। যেমন, কলেরা, উদরাময়, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের জীবাণু দূষিত জলের দ্বারা বাহিত হয়ে মানব শরীরে প্রবেশ করে ও রোগ সৃষ্টি করে। অপরদিকে, জমা জল ও জঞ্জাল মশা, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের জন্ম বা বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আদর্শ পরিবেশ হওয়ায় নগরায়ণ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, কালাজ্বর ইত্যাদি পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এই প্রাদুর্ভাব আরও প্রকট।

স্বল্প পরিসরে অনেক মানুষ একসাথে বসবাস করার কারণে ছোঁয়াচে রোগ বা কমিউনিকেবল ডিজিজের হারও বেশি হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, প্লেগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগ সামাজিক ভিড়ের কারণেই মূলত বিস্তার লাভ করে। আর সামাজিক অবক্ষয় বা দ্রুত পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি এবং অসাবধানতার কারণে এইডস্ (AIDS) বা হেপাটাইটিস-বি এর মতো রক্তবাহিত রোগের প্রসার ঘটছে।

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ রোগ সংক্রমণ ব্যতীত, বিভিন্ন প্রকার প্রদূষণের ফলস্বরূপ ক্যানসারের মতো মারক রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদির ফলে যে 'স্ট্রেস' বৃদ্ধি হয় তা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, হৃদ্‌রোগ, উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

Scanned by CamScanner

পরিবেশের উপর শিল্পায়নের প্রভাব

পরিবেশের উপর নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব প্রায় একই প্রকার। নগরায়ণের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃতি পরিবর্তন বা জীববৈচিত্র্যের উপর যে প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তা প্রায় একইরকম। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধান পরিবেশগত প্রভাবই হল পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বা অপব্যবহার।

শিল্পের প্রকৃতি অনুসারে প্রদূষকের বা বর্জ্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, ফলে শিল্প অনুসারে পরিবেশগত সমস্যাগুলিও বিভিন্ন হয়। যেমন, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভাসমান কণিকার দ্বারা বায়ুদূষণ এবং বর্জ্যতাপের দ্বারা তাপীয় দূষণ (জলদূষণ) প্রধান সমস্যা। অন্যদিকে রাসায়নিক শিল্পক্ষেত্রে বা তৈল শোধনাগারের ক্ষেত্রে গ্যাসীয় বায়ুদূষণ এবং রাসায়নিক জলদূষণ মূল সমস্যা সৃষ্টি করে। রং বা ডাই শিল্প, রঙে ব্যবহৃত ভারী ধাতু সংক্রান্ত দূষণ সৃষ্টি করে। আবার জৈব রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা জলের জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি।

তবে পরোক্ষভাবে বলা যায় শিল্পায়ন, কর্মসৃষ্টির আধার হওয়ায়, শিল্পায়নকে কেন্দ্র করেই নগরায়ণ হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে নগরায়ণজনিত সকল প্রকার পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার জন্যেই শিল্পায়নের দায় অনস্বীকার্য।

পরিবেশের উপর কৃষির প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাত ধরে নগরায়ণ বা শিল্পায়নের বিকাশ ঘটার অনেক আগেই কৃষিকাজ শুরু হয় এবং তজ্জনিত পরিবেশ ক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বর্তমান পরিস্থিতিতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ও তার জোগান অপরিবর্তিত রাখার তাগিদে কৃষিকাজের উপরও চাপ বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে উচ্চফলনশীল ফসল, শক্তি নিবিড় কৃষিকাজ ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তার ফলস্বরূপ অত্যধিক পরিমাণে সার/রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার মৃত্তিকা এবং তৎসংলগ্ন জলদূষণ ঘটায়।

জলাশয় অত্যধিক পরিমাণে পৌষ্টিক পদার্থ (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস) মেশার ফলে জলে শৈবালের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং অচিরে শৈবালের একটি ঘন স্তর (অ্যালগাল ব্লুম) জলাশয়ের আলোকগ্রাহিতা কমিয়ে দেয়। সূর্যালোক জলে প্রবেশ করতে না পারায় ধীরে ধীরে জলাশয়ের নিম্নভাগের সকল উৎপাদক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং উৎপাদকের অভাবে সামগ্রিকভাবে জলীয় বাস্তুতন্ত্রটি নষ্ট হয়ে, জলাশয়টি ধ্বংস হয়। এই পদ্ধতিকে বলে ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication)।

এছাড়া শক্তি নিবিড় কৃষিকাজ মাটির গঠনের সমূহ ক্ষতি করে এবং মাটির গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভূমিক্ষয়ের হার বৃদ্ধি পায়।

শক্তি নিবিড় কৃষি সাধারণত প্রচুর পরিমাণে জলনির্ভর হয়, এবং ভৌমজল উত্তোলনের কারণে, কৃষিকাজ পক্ষান্তরে জলসম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে, যা কখনো এতটাই বেশি যে, ৩... ফলে ভূমধ্যস্থ নুন উঠে এসে মৃত্তিকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে।

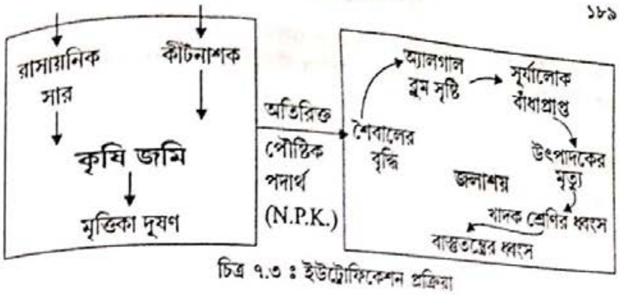

চিত্র ৭.৩ : ইউট্রোফিকেশন প্রক্রিয়া

উচ্চ ফলনশীল ফসলের (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা জিন প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত) ব্যবহার এবং একক ফসলের চাষ, স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। যা অনেক ক্ষেত্রে বহু স্থানীয় প্রজাতির বিপন্নতা বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে ওঠে।

নমুনা প্রশ্ন সম্ভার

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. জনসংখ্যার বৃদ্ধি কীভাবে পরিবেশ বিপন্নতার সৃষ্টি করে তার উপর একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।
২. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন তত্ত্বটি ও এর ধাপগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. পরিবেশের উপর নগরায়ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবগুলির উপর একটি টীকা লেখ।
৪. নগরায়ণের স্বাস্থ্যগত প্রভাবগুলি বিশদে আলোচনা কর।
৫. পরিবেশের উপর কৃষিকাজের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
৬. বাস্তুরীতির উপর নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব সম্পর্কে একটি রচনা লেখ।
৭. ইউট্রোফিকেশন কী? এর পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৮. 'শক্তিনিবিড় কৃষি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর'-বিবৃতিটির যথার্থতা বিচার কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১. পৃথিবীর ধারণক্ষমতা বলতে কী বোঝ?
২. ডিক্লাইনিং পপুলেশন কী?
৩. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের চতুর্থ ধাপে কী ঘটে ও কেন?
৪. জন্মহারের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বা পার্থক্য আলোচনা কর।
৫. হিট আইল্যান্ড বা উষ্ণবৃত্ত কী?
৬. উষ্ণবৃত্ত কীভাবে তৈরি হয়?
৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কিছু ক্রান্তীয় রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলি বর্ণনা কর।
৮. পরিবেশগত দিক থেকে জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?

Scanned by CamScanner

৯. জীববৈচিত্র্যের উপর নগরায়ণের প্রভাবগুলি লেখ।

১০. জিন প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত জীবসমূহের প্রকৃতিক জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব আলোচনা কর।

টীকা লেখ

১. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন

২. ধারণ ক্ষমতা

৩. ইউট্রোফিকেশন

৪. জনসংখ্যা ও পরিবেশ

৫. আর্বান হিট আইল্যান্ড বা উষ্ণবৃত্ত

৬. ম্যালথাসের তত্ত্ব

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

১. বার্ষিক গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকাশ করা হয়—
ক. জন প্রতি ১০০০ খ. নির্দিষ্ট সংখ্যায়
গ. শতাংশে ঘ. উপরোক্ত কোনোটাই নয়

২. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশন তত্ত্বটির প্রবক্তা—
ক. থমাস ম্যালথাস খ. ফ্রাঙ্ক ডব্লু নোটেস্টিন
গ. ওয়ারেন থমসন ঘ. উপরের কেউ নয়

৩. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের মূলভাগ কয়টি?
ক. ২ টি খ. ৩ টি
গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

৪. কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেতে পারে—
ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে
খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে
গ. পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করে,
ঘ. জনাহারের বৃদ্ধি ঘটিয়ে

৫. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের কোন্ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অতিদ্রুত হয়?
ক. প্রথম পর্যায় খ. দ্বিতীয় পর্যায়
গ. তৃতীয় পর্যায় ঘ. চতুর্থ পর্যায়

৬. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের কোন্ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অতি ধীর হয়?
ক. প্রথম পর্যায় খ. দ্বিতীয় পর্যায়
গ. তৃতীয় পর্যায় ঘ. চতুর্থ পর্যায়

৭. ডেমোগ্রাফিক ট্রাঞ্জিশনের চতুর্থ পর্যায়ে কোন্ বিশেষ ঘটনাটি ঘটতে পারে?
ক. কম মৃত্যুহার
খ. জনসংখ্যার অধোগতি বা ডিক্লাইনিং জনসংখ্যা
গ. জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি বা গ্রোইং জনসংখ্যা
ঘ. শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি

৮. আর্বান উষ্ণবৃত্ত সৃষ্টির কারণ—
ক. প্রতিফলক তলের বৃদ্ধি

খ. বায়ুমণ্ডলে অধিকতর তাপমোচন
গ. উলম্ব দেওয়ালের কারণে তাপের আবদ্ধিকরণ
ঘ. উপরের সবকটি কারণ

৯. জলাশয়ের ইউট্রোফিকেশনের মূল কারণ—
ক. বায়ুদূষণ
খ. শিল্প কলকারখানাজাত জলদূষণ
গ. কৃষিজাত জলদূষণ
ঘ. জৈবদূষিত পদার্থ

১০. মৃত্তিকা ক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ—
ক. অরণ্যচ্ছেদন খ. কৃষিকাজ
গ. তাপীয় বৃত্ত সৃষ্টি ঘ. আবহাওয়া পরিবর্তন

১১. নিম্নলিখিতের কোন্‌টি একটি পতঙ্গ বাহিত রোগ?
ক. ইনফ্লুয়েঞ্জা খ. এইডস
গ. ম্যালেরিয়া ঘ. প্লেগ

১২. নিম্নলিখিতের কোন্‌টি ইউট্রোফিকেশন ঘটাতে সক্ষম?
ক. নাইট্রেট খ. সায়ানাইড
গ. তৈলাক্ত পদার্থ ঘ. বিষাক্ত রঞ্জক

১৩. শক্তিনিবিড় কৃষি সাধারণত,
ক. মৃত্তিকা নির্ভর হয়
খ. জল নির্ভর হয়
গ. শ্রম নির্ভর হয়
ঘ. স্থানীয় প্রজ্ঞা নির্ভর হয়

১৪. ভারত উপমহাদেশের নগর সভ্যতা কত পুরনো?
ক. ২০০০ বছর খ. ২৩০০ বছর
গ. ৩৩০০ বছর ঘ. ৫৩০০ বছর

১৫. জিনপ্রযুক্তিজাত জীবসমূহের চাষের ফলে কী হতে পারে?
ক. স্থানীয় প্রজাতিগুলির অবলুপ্তি
খ. জীববৈচিত্র্যের বিকাশ
গ. খাদ্যে বিষক্রিয়া
ঘ. উপরোক্ত কোনোটি নয়

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরাবলি

১. গ	২. গ	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. ক
৭. খ	৮. ঘ	৯. গ	১০. ক	১১. গ	১২. ক
১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ক			

Scanned by CamScanner

8

পরিবেশগত দুর্যোগ ও বিপর্যয়

[Environmental Hazards and Disaster]

8.1 পরিবেশগত দুর্যোগ ও বিপর্যয় : বৈশিষ্ট্য ও ধরন (Environmental Hazards and Disaster : Nature and Types)

■ *দুর্যোগ কী ?*

দুর্যোগ বা হ্যাজার্ড (Hazard) হল ভূপৃষ্ঠে বা ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্ট বিপজ্জনক ঘটনা, যা থেকে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। দুর্যোগ সৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতির ভূমিকা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রকৃতি আলাদা ভাবে বা যৌথ ভাবে দুর্যোগ সৃষ্টি করে। দুর্যোগের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেমন বন্যা, ধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি। দুর্যোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'hazard' কথাটির সঙ্গে আরবি শব্দ 'Aj-zahr' কথাটির অর্থগত মিল আছে।

■ *বিপর্যয় কী ?*

বিপর্যয় বা ডিজাস্টার (Disaster) হল ভূপৃষ্ঠে বা ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্ট কোনো বিরাট আকস্মিক ঘটনার ফলে উদ্ভূত মহা-বিপর্যয়। ক্ষয়ক্ষতির বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বিপর্যয়ের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি ও ক্ষয়ক্ষতি বিপুল। তবে সব দুর্যোগের ফলে বিপর্যয় নাও ঘটতে পারে। বিপর্যয় উদ্ভিদ, প্রাণী, পরিবেশ ও মানুষের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। বিপর্যয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'disaster' কথাটি ফরাসি শব্দ 'disastre' থেকে এসেছে — 'dus' মানে অশুভ ও 'aster' মানে তারা বা নক্ষত্র।

■ *দুর্যোগ বা হ্যাজার্ড-এর বৈশিষ্ট্য কী ?*

(1) দুর্যোগ হল প্রাকৃতিক কাজ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের কাজের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা।

(2) দুর্যোগের ব্যাপকতা বিপর্যয়ের তুলনায় কম। দুর্যোগ ছোটো মাপের অল্প সময়ের বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি।

(3) দুর্যোগের পরিবেশগত প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সীমিত। কারণ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম। দুর্যোগের কারণে পরিবেশেরও কম ক্ষয়ক্ষতি হয়।

(4) দুর্যোগ অল্প সময়ের ঘটনা — এর ব্যাপ্তিকাল কম।

■ *বিপর্যয় বা ডিজাস্টার-এর বৈশিষ্ট্য কী ?*

(1) বিপর্যয় প্রাকৃতিক ও মানুষের কাজের ফলে উদ্ভূত ভয়ংকর ও অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনা।

(2) বিপর্যয় হল দুর্যোগের ফল। বড়ো মাপের দুর্যোগ বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

(3) বিপর্যয়ের ব্যাপকতা দুর্যোগের তুলনায় বহুগুণে বেশি। তাই বিপর্যয় হল বড়ো স্কেলের অল্প সময়ের বা দীর্ঘ সময়ের বিরাট এলাকাজুড়ে ঘটা ভয়ংকর ক্ষতির ঘটনা।

(4) বিপর্যয়ের ফলে ধনসম্পত্তি, সম্পদের ভীষণ ক্ষতি হয়। মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। প্রাণহানি ঘটে। মানুষ আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, চিকিৎসাহীন হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

দুর্যোগ কয় ধরনের?

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দুর্যোগ (Hazard) তিন ধরনের বলে মনে করেন, যেমন—

(1) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড** (Natural hazard), যেমন— ভূমিকম্প, বন্যা, ধস, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি।

(2) **আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোয়াসি-ন্যাচারাল হ্যাজার্ড** (Quasi-natural hazard), যেমন— নদী পাড়ের ভাঙন, অনিয়ন্ত্রিত বনহনন ইত্যাদি।

(3) **মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বা ম্যান-মেড হ্যাজার্ড** (Man-made hazard), যেমন— তেজস্ক্রিয় দুর্যোগ (পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা) অর্থাৎ রেডিয়োঅ্যাকটিভ হ্যাজার্ড (Radioactive hazard)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী?

কোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হওয়া আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে যখন মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তখন ওই সাময়িক ক্ষতিকারী ঘটনাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড (Natural Hazard) বলে। যেমন ভূমিকম্প, ধস, অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়, খরা, বন্যা ইত্যাদি।

আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী?

মানুষের অবিবেচনামূলক কাজের প্রভাবে যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা ও তীব্রতা বাড়ে, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, তাদের আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোয়াসি-ন্যাচারাল হ্যাজার্ড (Quasi-natural hazard) বলে। যেমন— নদীপাড়ের ভাঙন, উপকূলের ভাঙন, পাহাড়ি অঞ্চলে ধস ইত্যাদি। এই ধরনের দুর্যোগে মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

বস্তুত পাহাড়ি ঢালে প্রচুর গাছ কেটে ফেলা হলে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়ে যায়। কারণ মাটি আলগা হয়ে যায়। তেমনি নদী পাড়ের গাছপালা কেটে ফেলা হলে বা নদী থেকে যেমন খুশি বালি, পাথর তুলে নেওয়া হলে নদীপাড়ের মাটি ক্ষয় হতে পারে।

মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ কী?

যে দুর্যোগ সৃষ্টির মূল কারণ হল মানুষ, মানুষের দক্ষতার অভাব, মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও রাজনীতি, লোভ, সেই বিপজ্জনক ক্ষতিকর ঘটনাগুলি হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বা ম্যান-মেড হ্যাজার্ড (Man-made hazard)। যেমন— বনহনন, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, জাতিদাঙ্গা, মানুষের বাধ্যতামূলক দেশান্তর (Forced migration), সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) ইত্যাদি।

মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের কারণ কী?

মানুষের তৈরি দুর্যোগের কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম যেমন —

(1) অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কাটা হলে, নিয়ম না মেনে উঁচু বড়ো বাড়ি বা রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হলে, জলাশয় বুজিয়ে দেওয়া হলে, যেখানে সেখানে পাঁচিল দেওয়া হলে বা মাটি কাটা হলে ধস, বন্যা প্রভৃতি দুর্যোগের প্রবণতা বাড়ে।

(2) যান্ত্রিক ত্রুটি, দক্ষতার অভাব, বেপরোয়া মনোভাব, অতিরিক্ত লোভ ও দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য শিল্প, পরিবহন, চিকিৎসা ও নির্মাণ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। মানুষের মৃত্যু হয়। বহু কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

(3) অশিক্ষা, কুসংস্কার, আস্থার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, হিংসা, ক্ষুদ্রতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়, যা মানুষের তৈরি দুর্যোগ।

দুর্যোগ ও বিপর্যয় কয় ধরনের ও কী কী?

নীচের প্রবাহচিত্রে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ধরনগুলি দেওয়া হল—

দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Hazards and Disaster)

- পার্থিব দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Terrestrial)
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Natural)
    - ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Geological)
      - ভূমিকম্প
      - অগ্ন্যুৎপাত
      - সুনামি
    - ভূমিরূপগত দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Geomorphological)
      - ধস
      - হিমানী সম্প্রপাত
      - নদীপাড়ের ভাঙন
      - উপকূলের ভাঙন
    - বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Atmospheric)
      - বন্যা
      - হড়পা বান
      - খরা
      - ঘূর্ণিঝড়
      - তুষার ঝড় বা ব্লিজার্ড
      - শিলাবৃষ্টি
      - বজ্রপাত
      - শৈত্যপ্রবাহ
      - তাপপ্রবাহ
      - দাবানল
    - মাটি সংক্রান্ত দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Pedological)
      - লবণীকরণ বা স্যালিনাইজেসন
      - মরুকরণ বা ডেজার্টিফিকেসন
  - আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Quasi-natural)
    - বন্যা
    - ধস
    - ভূমিক্ষয়
  - মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Anthropogenic)
    - যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা, বাধ্যতামূলক দেশান্তর, সন্ত্রাসবাদ
    - প্রযুক্তিগত দুর্যোগ ও বিপর্যয়
      - শিল্প দুর্ঘটনা
      - পথ দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা
      - পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা
      - রাসায়নিক গ্যাস দুর্ঘটনা
      - পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ
    - রোগ, মহামারি
    - দূষণ (বায়ু, জল, মাটি, বর্জ্য, শব্দ ইত্যাদি)
    - অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (মন্দা, নিষেধাজ্ঞা, বেকারত্ব ইত্যাদি)
- মহাজাগতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Extra-terrestrial)

■ *বিপর্যয় কয় ধরনের ও কী কী?*

বিপর্যয় দু'ধরনের। যথা— (1) স্থায়িত্বের ভিত্তিতে বিপর্যয় ও (2) উৎস বা নিয়ন্ত্রক অনুসারে বিপর্যয়।

■ *স্থায়িত্ব অনুসারে বিপর্যয় কী কী?*

স্থায়িত্ব (duration) অনুসারে বিপর্যয় হল—

(1) দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়, যেমন— দুর্ভিক্ষ, দাবানল, খরা।

(2) স্বল্পমেয়াদি বিপর্যয়, যেমন— ধস, হিমানী সম্প্রপাত, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়।

■ *উৎস এবং নিয়ন্ত্রক অনুসারে বিপর্যয় কী কী?*

বিজ্ঞানী ই এল জোন্‌স (E L Jones, 1981) বিপর্যয়ের উৎস এবং নিয়ন্ত্রকের ভিত্তিতে বিপর্যয়কে (disaster) চারভাগে ভাগ করেছেন, যেমন—

(1) ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় (Geological disaster) যেমন— ভূমিকম্প, ধস, হিমানী সম্প্রপাত, সুনামি, অগ্ন্যুৎপাত।

(2) আবহাওয়া সংক্রান্ত বিপর্যয় (Atmospheric disaster) যেমন— বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রঝড়, দাবানল।

(3) জীবমণ্ডলীয় বিপর্যয় (Biospheric disaster) যেমন— কৃষিতে রোগ-পোকার আক্রমণ, মহামারি, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু।

(4) সামাজিক বিপর্যয় (Social disaster) যেমন— যুদ্ধ, দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অগ্নিকাণ্ড।

■ *ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় কী?*

ভূঅভ্যন্তরে চাপ ও তাপের তারতম্য এবং মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় পাত বা প্লেটের (plates) স্থানান্তরের প্রভাবে উদ্ভূত বিপজ্জনক প্রাকৃতিক ঘটনাকে ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Geological hazard and disaster) বলে। ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কারণে পরিবেশের রূপান্তর হয়। জীবমণ্ডলের ক্ষতি হয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। উদাহরণ — ভূমিকম্প, সুনামি, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। যেমন— 2004 সালে ভারত মহাসাগরে সুনামি।

■ *আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ ও বিপর্যয় কী?*

বায়ুমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতার ব্যাপক তারতম্যের কারণে উদ্ভূত বিপজ্জনক ঘটনাকে আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Atmospheric hazard and disaster) বলে। উদাহরণ — বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি। যেমন— 2009 সালে সুন্দরবন ও সন্নিহিত এলাকায় "আয়লা" নামের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়।

■ *জীবমণ্ডলীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় কী?*

জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ, জীবাণু প্রভৃতির ক্ষতিকর প্রভাবে সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনাকে জীবমণ্ডলীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Biospheric hazard and disaster) বলে। উদাহরণ— বার্ড ফ্লু (Bird Flu), সোয়াইন ফ্লু (Swine Flu), পঙ্গপালের আক্রমণ, HIV সংক্রমণ, ইবোলা (Ebola) রোগ, ধান-গম-তুলো-আলুর রোগ ইত্যাদি। যেমন— 2006 থেকে 2021 সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভারতে বার্ড ফ্লু-এর সংক্রমণ। 1915 সালে প্যালেস্টাইনে পঙ্গপালের আক্রমণ ইত্যাদি।

■ *সামাজিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় কী?*

মানুষের তৈরি নেতিবাচক ভয়ংকর ঘটনাকে সামাজিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Social hazard and disaster) বলে। উদাহরণ— বিশ্বযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, শিল্প দুর্ঘটনা, পরিবহন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, জলাভূমি বুজিয়ে জমি হস্তান্তর ও বেআইনি নির্মাণ ইত্যাদি।

■ ***দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যে তফাত কোথায়?***

দুর্যোগ ও বিপর্যয় হল বিপজ্জনক ঘটনা যা মানুষ ও পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে। এদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট সারণিতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

ভিত্তি	দুর্যোগ (Hazard)	বিপর্যয় (Disaster)
কার্যকারণ	দুর্যোগের কারণে বিপর্যয় হয়। দুর্যোগ হল বিপর্যয়ের উৎস।	বিপর্যয় হল দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব। তাই বিপর্যয় হল ফলাফল।
স্থায়িত্ব	স্বল্প বা সীমিত। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট। যেমন— ভূমিকম্প।	দীর্ঘস্থায়ী। কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর। যেমন— বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব
ঘটনার পুনরাবৃত্তি	বারবার ঘটতে পারে।	ঘনঘন ঘটে না।
ব্যাপ্তি	স্বল্প বা ছোটো এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	ব্যাপক এলাকা জুড়ে, কখনও অনেকগুলি দেশ জুড়ে বিপর্যয় ঘটে।
সাহায্য ও সহযোগিতা	কোনো রাজ্য বা দেশের নিজ ক্ষমতায় দুর্যোগ আয়ত্তে আনা যায়।	বিপর্যয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রায় সবক্ষেত্রেই দরকার হয়।

■ ***দুর্যোগ সহনশীলতা বা হ্যাজার্ড রেজিলিয়েন্স কী?***

কোনো দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপন্নতাকে সুপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিয়ে ফেলার চেষ্টাকে দুর্যোগ সহনশীলতা বা ইংরেজিতে হ্যাজার্ড রেজিলিয়েন্স (hazard resilience) বলে। এই সহনশীলতার (resilience) মাধ্যমে পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য (eqilibrium) বজায় থাকে।

■ ***ঝুঁকি বা রিস্ক কাকে বলে?***

ঝুঁকি বা ইংরেজিতে রিস্ক (risk) বলতে ভবিষ্যতে দুর্যোগ বা খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কাকে বোঝায়। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা আছে, এমন যে-কোনো পরিস্থিতিই ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিবহুল। দুর্যোগের ধরন অনুসারে ঝুঁকির মাত্রা বদলে যায়, যেমন— ভূমিকম্প বা ঝড় হল উচ্চস্তরের ঝুঁকি (high level risk), ধস ও হিমানী সম্প্রপাত হল মধ্যম স্তরের ঝুঁকি (medium level risk) ইত্যাদি।

■ ***ঝুঁকি বা রিস্ক কয়প্রকার ও কী কী?***

ঝুঁকি (risk) দু'প্রকার, যথা— (i) স্বেচ্ছাকৃত (voluntary) ঝুঁকি, যেমন— ক্যানসার হতে পারে জেনেও সিগারেট ও গুটখা খাওয়া। (ii) অনিচ্ছাকৃত (involuntary) ঝুঁকি, যথা— বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি।

■ ***বিপন্নতা বা ভালনারেবিলিটি কী?***

দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ফলে মানুষের অসহায়তা ও অক্ষমতাকে বিপন্নতা বলে। বিপন্নতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ভালনারেবিলিটি (vulnerability)। সব ধরনের দুর্যোগ বা বিপর্যয়ে বিপন্নতার মাত্রা সমান নয়। আবার পৃথিবীর সব জায়গায় মানুষের বিপন্নতা একই ধরনেরও নয়। যেমন, জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামির কারণে মানুষ বেশি বিপন্ন হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে বিপন্নতার অন্যতম কারণ হল দাবানল (wildfire)।

■ ***ট্রমা বা মানসিক ধাক্কা কী?***

ট্রমা (trauma) বলতে দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের কারণে মানসিক অবসাদ বা মানসিক আঘাতজনিত বিকারকে বোঝায়। ট্রমা স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কাঁপুনি, অস্থিরতা, দুঃস্বপ্ন, শ্বাসকষ্ট, মৃত্যুভয় ইত্যাদি হল ট্রমার লক্ষণ।

■ ***সামর্থ্য বা ক্যাপাসিটি বলতে কী বোঝায়?***

সামর্থ্য বা ইংরেজিতে ক্যাপাসিটি (capacity) বলতে দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাকে বোঝায়। সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন, নেতৃত্ব, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে সামর্থ্য গঠন করা যায়। যেমন— জাপানিদের ভূমিকম্পের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা।

হ্যাজার্ড ক্যালেন্ডার কী?

হ্যাজার্ড ক্যালেন্ডার বলতে বছরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতু বা সময়ে কোনো দুর্যোগের ঘটনা ঘটার বাৎসরিক তালিকাকে বোঝায়। হ্যাজার্ড ক্যালেন্ডার জানা থাকলে দুর্যোগের মোকাবিলা করা সহজ হয়, যেমন, ভারতে হ্যাজার্ড ক্যালেন্ডার হল —

(1) **খরা** — মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে (শুখা মরশুমে);

(2) **বন্যা** — মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে (বর্ষার মরশুমে);

(3) **শিলাবৃষ্টি** — এপ্রিল থেকে মে মাসে;

(4) **ঘূর্ণিঝড়** — মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে;

(5) **ধস** — জুন থেকে অক্টোবর মাসে (পাহাড়ে বর্ষার মরশুমে);

(6) **দাবানল** — মার্চ থেকে মে মাসে [জুলাই–অক্টোবর মাসে] (এছাড়া, দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে)

(7) **শৈত্যপ্রবাহ** — অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (উত্তর ভারতে);

(8) **ধুলিঝড়** — এপ্রিল থেকে মে মাসে (শুখা মরশুমে);

(9) **নদীপাড়ের ক্ষয় বা ভাঙন** — সারা বছর (বর্ষায় বেশি);

(10) **উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র সৈকতের ক্ষয় বা ভাঙন** — সারা বছর।

8.2 ধস (Landslides)

ধস একটা প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একে বন্ধ করা যায় না। তবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পাহাড়ি এলাকার মানুষ ও পরিবেশকে বিপর্যস্ত করার জন্য ধসের জুড়ি নেই।

ধস কাকে বলে?

পাহাড়ের ঢাল বরাবর মাধ্যাকর্ষণের টানে পাথরের চাঁই, শিলাচূর্ণ, মাটি এবং অন্যান্য আলগা পদার্থের হঠাৎ নেমে আসা বা খসে পড়ার ঘটনাকে ধস (Landslides) বলে। সাধারণত বর্ষাকালে পাহাড়ে ধস নামে। তবে ভূমিকম্প হলে বা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময়েও ধস নামতে পারে। ধস নামলে মানুষ ও পরিবেশের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই এটি পাহাড়ি এলাকার মানুষের কাছে একটা বিশেষ সমস্যা।

ধস কেন হয়?

ধস নামার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কিছু কারণ প্রকৃতির নিজস্ব আর কিছু মানুষের তৈরি।

- **প্রাকৃতিক কারণ :**

(1) **প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য :** পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে মাটি, পাথর জলে ভিজে আলগা ও ভারী হয়ে যায়। তখন মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে খসে পড়ে। এই জন্য দার্জিলিং, সিকিম ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলে প্রতি বর্ষায় ধস নামে।

চিত্র : পাহাড়ি ঢালে ধস

(2) **পাথর আলগা হওয়ার জন্য :** পাহাড়ি অঞ্চলে বহুদিন ধরে জল, বায়ু, সূর্যতাপ, গাছের শিকড়ের চাপ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রভৃতির কারণে পাথর ফেটে যায়। শিলা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ওই দুর্বল পাথরের স্তূপ ধস হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে।

(3) **মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকার জন্য :** যে মাটিতে বালির ভাগ বেশি, সেই মাটির মধ্যে সহজেই জল ঢুকে যেতে পারে। ফলে মাটি ভারী হয়ে ধস তৈরি করে। দার্জিলিং, সিকিম অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই মাটিতে বালির ভাগ বেশি বলে বর্ষাকালে ধস নামে।

(4) **ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের জন্য :** ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে আসায় মাটি মুহুর্মুহু কাঁপতে থাকে। ফলে ধস নামে।

- **মানুষের তৈরি কারণ :**

(1) **মাটির ওপরে গাছপালার আবরণ না থাকার জন্য :** বন কেটে সাফ করে ফেললে মাটির ওপরে তখন গাছপালার আবরণ থাকে না। এই অবস্থায় বৃষ্টির জল দিনের পর দিন মাটিকে সরাসরি আঘাত করে ক্ষয় করে। আর প্রচুর জল মাটির মধ্যে অনবরত ঢুকে যায়। মাটি দুর্বল হয়ে খসে পড়ে। ধস নামে।

(2) **দুর্বল পাহাড়ি ঢালে নিয়ম না মেনে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর বানালে :** দুর্বল ও খাড়াই পাহাড়ি ঢালে নিয়ম না মেনে বাড়ি, ঘর, রাস্তাঘাট বানালে, দুর্বল মাটিতে খুব গভীরে শিকড় চালাতে পারে এমন গাছ পুঁতলে, শহরের জঞ্জাল অনেক দিন ধরে পাহাড়ের ঢালে জমা করা হলে ধস নামে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও গ্যাংটকের আশেপাশে এ কারণে বহুবার ধস হয়েছে।

ধসকে পরিবেশের সমস্যা বলে মনে করা হয় কেন?

ধস একটা প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক ঘটনা। তবে এটি পরিবেশ ও মানুষের কাছে ইদানীং বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ পাহাড়ি এলাকায় এখন যত লোক বেড়েছে এবং এলাকার উন্নতির জন্য এখন যত টাকা বিনিয়োগ করা হয়, আগে জনসংখ্যার চাপ ততটা ছিল না বলে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণও কম ছিল। তাই চা বাগান, আপেল বাগান, কমলালেবুর বাগান, রাস্তাঘাট, শপিং মল, বাড়িঘরও এখনকার মতো আগে এত তৈরি হয়নি। ফলে ধস নামলে এখন লোকের অনেক বেশি ক্ষতি হয়। প্রাণহানি ঘটে। সম্পত্তি নষ্ট হয়। পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়।

ধসের জন্য পরিবেশ ও মানুষের কী কী ক্ষতি হয়?

- **ধসের জন্য পরিবেশের ক্ষতি :**

(1) ধস নামলে গাছপালা ভেঙে পড়ে। ফলে বনভূমি ও বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়।

(2) ধসের ফলে পাহাড়ের ঢালে কঠিন পাথর বা শিলাস্তর বেরিয়ে পড়ে। তাই ধসের ফলে যেখান থেকে ধস নামল, আর ধসের আলগা পাথুরে মাটি যেখানে নেমে জমা হল, সেই দু জায়গারই মাটির গুণ নষ্ট হয়।

(3) ধস নামার জন্য পাহাড়ের ঢালের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। দুর্বল হয়। ওই দুর্বল ঢালের ওপর বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তৈরি করা যায় না।

(4) পাহাড়ি ধস অনেক সময় নামতে নামতে নদীর বুকে এসে জমা হয়। ফলে নদীর পথ আটকে যায়। তখন এই অস্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা বাঁধের পিছনে জল জমতে থাকে। বর্ষায় জলের চাপে ওই বাঁধ ভেঙে গেলে, প্রবল জলের তোড়ে নদীর দুপাশে বন্যা হয়। এইভাবে 1968 সালে তিস্তা নদীর বন্যায় জলপাইগুড়ি শহর ভেসে গিয়েছিল।

(5) ধস নামার জন্য ভূমিক্ষয় হয়।

- **ধস নামার জন্য মানুষের ক্ষতি :**

(1) ধসের ফলে বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। এমনকি, বড়োসড়ো ধস নামলে গ্রামকে গ্রাম লোপাট হয়ে যায়। দার্জিলিং শহরের আশপাশের মনপড়ি বস্তি, আলুবাড়ি, ভুটিয়া বস্তি, পানডাম চা বাগান, তুংসুং বস্তিতে ধসের জন্য বহুবার ঘরবাড়ির খুব ক্ষতি হয়েছে।

(2) রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। যেমন— দার্জিলিং যাওয়ার পথে পাগলাঝোড়ার কাছে ধসের জন্য রাস্তা এত নষ্ট হয় যে, প্রায় সারা বছর ধরে মেরামত করার দরকার পড়ে। মহানদীর কাছে টয়ট্রেনের লাইনও ফি বছর ধসের জন্য নষ্ট হয়।

(3) চা-বাগান, কমলালেবু, আপেল, সবজি বাগানের ক্ষতি হয়।

চিত্র : ধসের ফলে বাড়িঘরের ক্ষতি

(4) ধস নামার ফলে চাষ ও চাষির আর্থিক ক্ষতি হয়।

(5) ধস নামার জন্য রাস্তাঘাট বন্ধ থাকলে টুরিস্ট আসতে পারে না। ফলে পর্যটন শিল্পের ক্ষতি হয়।

(6) ধসের ফলে মানুষের প্রাণহানি ঘটে। গৃহপালিত জীবজন্তু মারা যায়।

(7) ধসের জন্য মানুষের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতির পরিমাণও প্রচণ্ড।

■ *ধস নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কী?*

ধস নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায়গুলি হল—

(1) যেখানে সেখানে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তৈরি না করা।

(2) বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করার আগে ওই এলাকার মাটি, পাথর ইত্যাদি কতটা চাপ সহ্য করতে পারে, তার জন্য মাটি ও শিলা পরীক্ষা করা উচিত।

(3) পাহাড়ের ঢালে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা দরকার।

(4) জমির সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা বা ল্যান্ডইউজ প্ল্যানিং করা প্রয়োজন। যেখানে যেমন মাটির গুণ ও চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, সেই মতো কোথাও বনভূমি, কোথাও জনবসতি, কোথাও রাস্তাঘাট, কোথাও চা-বাগান পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা দরকার।

(5) ধস নামলে লোকজনের প্রাণরক্ষা করার জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(6) ধসপ্রবণ এলাকায় মাটির মধ্যে জল যাতে বসতে না পারে এবং উদ্বৃত্ত জমা জল যাতে সহজে বেরিয়ে আসে তার জন্য নালা বা নালি কাটা করা দরকার।

(7) পাহাড়ের দুর্বল ঢাল যাতে ধসে না যায়, সেজন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঁচিল গেঁথে দেওয়া দরকার। এই পাঁচিলগুলি কংক্রিটের হতে পারে, বা পাথরের চাঁই পরের পর সাজিয়ে জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া যেতে পারে (wire crate wall)।

(8) পাহাড়ি ঢালে নতুন করে গাছ লাগানো দরকার এবং বেআইনি গাছ কাটা বন্ধ করা প্রয়োজন।

(9) লোকজনকে ধসের বিপদ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করা জরুরি।

■ *ভারতের ধসপ্রবণ এলাকা কোন্‌গুলি?*

ধস যেহেতু পাহাড়ি এলাকায় নামে, তাই হিমালয়, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, পশ্চিমঘাট পর্বতের বিভিন্ন অংশ ধসপ্রবণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দার্জিলিং, কার্সিয়াং, গ্যাংটক, শিলং, অরুণাচলের পাহাড়, লাদাখ, উত্তরকাশী, নৈনিতাল ইত্যাদি।

■ *পশ্চিমবঙ্গের ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলি কোথায় অবস্থিত?*

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা বিশেষভাবে ধসপ্রবণ। এখানে ফি-বছর বর্ষায় কোথাও না কোথাও ধস নামে। এই জেলার যে সমস্ত এলাকা ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলি হল— (1) কার্সিয়াং, (2) মহানদী, (3) চুনাভাটি, (4) রাম্মাম, (5) লোধামা, (6) সিরিখোলা (শ্রীখোলা), (7) লাভা ইত্যাদি।

- বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর কয়েকটি বড়ো ধসের ঘটনা :

সাল	স্থান	মৃতের সংখ্যা	ধসের কারণ
1916	ইতালি	10,000 জন	বৃষ্টিপাত
1920	চিন	2,00,000 জন	ভূমিকম্প
1949	সোভিয়েত ইউনিয়ন	12,000—20,000 জন	ভূমিকম্প
1962	পেরু	4,000—5,000 জন	বৃষ্টিপাত
1970	পেরু	70,000 জন	ভূমিকম্প
1985	কলম্বিয়া	23,000 জন	অগ্ন্যুৎপাত
1990	ইরান	35,000 জন	ভূমিকম্প
1993	ভারত	10,000 জন	ভূমিকম্প
1999	তুরস্ক	15,600 জন	ভূমিকম্প
2001	ভারত (কেরালা)	100 জন	ভূমিকম্প
2013	ভারত (কেদারনাথ সন্নিহিত অঞ্চল, গাড়োয়াল হিমালয়)	5,700 জন	মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান
2017	কলম্বিয়া	314 জন	বৃষ্টিপাত
2019, 2020, 2021	ভারত (অসম, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ নাগাল্যান্ড, মহারাষ্ট্র, কেরালা)	আহত মানুষের সংখ্যা কয়েক শত	বৃষ্টিপাত

8.3 ভূমিকম্প (Earthquake)

ভূমিকম্প কাকে বলে?

প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে হঠাৎ যে কম্পন হয় তাকে ভূমিকম্প বা ভূকম্প (earthquake) বলে। ভূমিকম্পের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ভূমিকম্পের কাঁপুনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এই কম্পন যত দূরে ছড়ায়, তার জোর বা ধ্বংস করার ক্ষমতা তত কমে।

ভূমিকম্প কেন হয়?

ভূমিকম্প অনেক কারণে হতে পারে। এর মধ্যে কিছু প্রকৃতির নিজস্ব। আর অল্প কিছু মানুষের কাজের প্রভাবে।

- **প্রাকৃতিক কারণ :**

(1) চলমান প্লেট বা পাতের জন্য : ভূবিজ্ঞানীদের মতে ভূত্বক অনেকগুলি ছোটো-বড়ো শক্ত পাথরের চাদরে মোড়া রয়েছে। শিলায় তৈরি এই চাদরগুলিকে পাত বা 'প্লেট' বলে। এই পাতগুলি সচল।

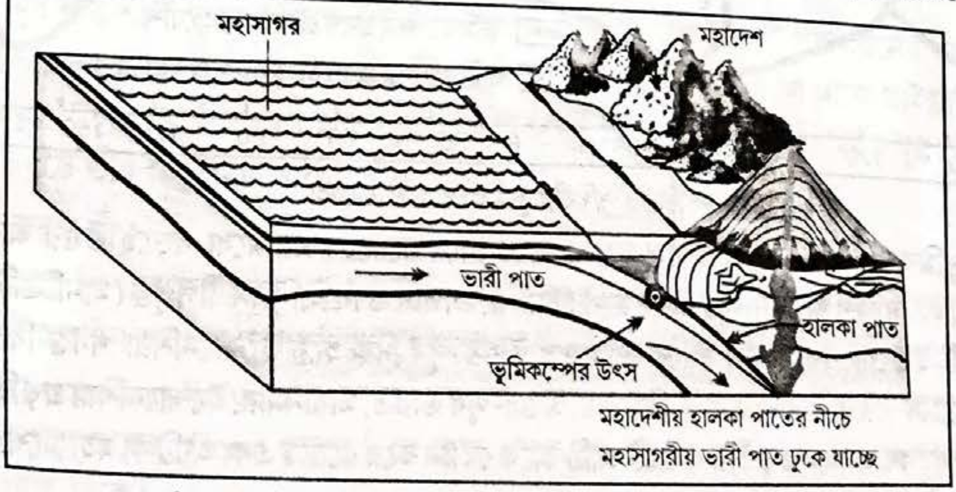

চিত্র : ভারী ও হালকা প্লেট বা পাতের সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি

ভূত্বকের পাতগুলি চলতে চলতে যখন একটা পাত অন্য পাতের সঙ্গে ধাক্কা খায় বা হালকা পাতের নীচে ভারী পাত ঢুকে পড়ে তখন ভূমিকম্প হয়। যেমন— 1966 ও 1970-এ তুরস্কের ভূমিকম্প, 2004-এর ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে ভূমিকম্প ও সুনামি পাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য ঘটেছিল।

(2) অগ্ন্যুৎপাতের জন্য : আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভা সজোরে বেরিয়ে আসার সময়ে ভূমিকম্প হয়। যেমন, 1944 খ্রিস্টাব্দে ইতালির ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত ও ভূকম্প। 2014 সালের 31 মার্চ ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুদ্‌গম ইত্যাদি। তবে সব অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে ভূমিকম্প হয় না।

(3) ধস নামার জন্য : পাহাড়ি অঞ্চলে বিরাট ধস নামলে স্থানীয় ভাবে স্বল্প তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে। আসলে ধসের সময়ে হাজার হাজার টন ওজনের মাটি, পাথর খসে নেমে আসে ও সজোরে নীচে ধাক্কা মারে। ভূ ত্বক কেঁপে ওঠে।

(4) ভূঅভ্যন্তরের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্য : পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলায় ভাঁজ পড়লে বা বড়োসড়ো ফাটল (চ্যুতি) দেখা দিলে, অথবা চাপের তারতম্য হলে ভূমিকম্প হয়।

● **মানুষের তৈরি করা কারণ :** (1) ভূত্বকের দুর্বল অংশে বড়ো জলাধার তৈরি করলে, ও (2) মাটির নীচে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করলে ভূমিকম্প হয়।

■ ***পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলি কোথায় অবস্থিত?***

পৃথিবীতে তিনটি প্রধান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বা বলয় আছে।

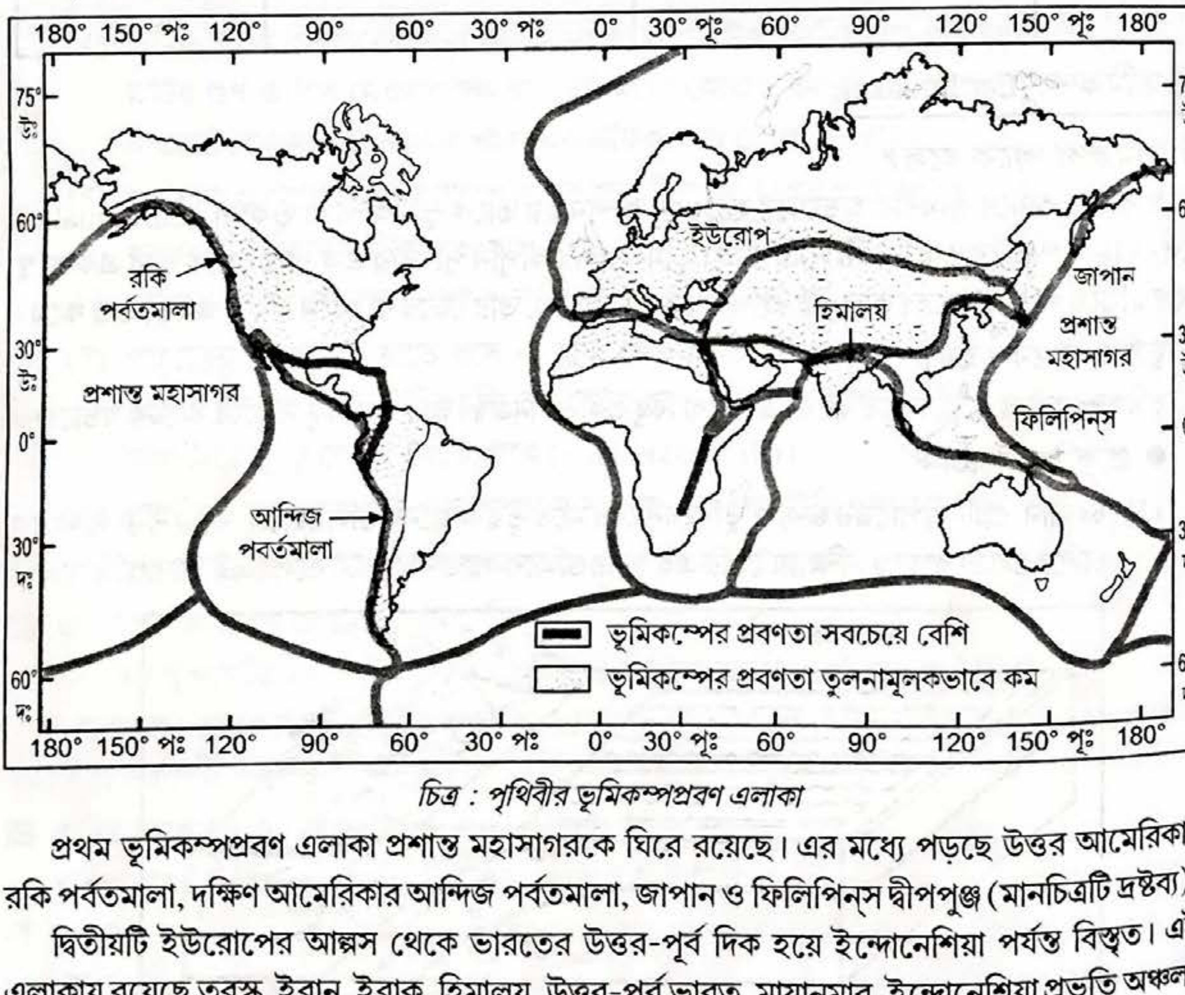

চিত্র : পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা

প্রথম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রয়েছে। এর মধ্যে পড়ছে উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা, জাপান ও ফিলিপিন্‌স দ্বীপপুঞ্জ (মানচিত্রটি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়টি ইউরোপের আল্পস থেকে ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক হয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকায় রয়েছে তুরস্ক, ইরান, ইরাক, হিমালয়, উত্তর-পূর্ব ভারত, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের তৃতীয় বলয়টি আফ্রিকাকে বেষ্টন করে রয়েছে এবং আফ্রিকা মহাদেশের ভেতরে ঢুকেছে।

■ *ভূমিকম্প মাপা বা রেকর্ড করা যন্ত্রের নাম কী?*

ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম সিস্‌মোগ্রাফ (Seismograph)। গ্রিক শব্দ সিস্‌মোস (Seismos) কথার মানে হল ভূকম্পন।

■ *সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্র কীভাবে কাজ করে?*

আধুনিক সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক কাগজের ওপর আলোকরশ্মির সাহায্যে ভূকম্পন সরাসরি আঁকা হয়ে যায়। পুরোনো ধরনের সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ঘুরন্ত চোঙ-এর গায়ে আটকানো কাগজের ওপর ভূকম্পন রেখা সরাসরি আঁকা হয়ে যেত।

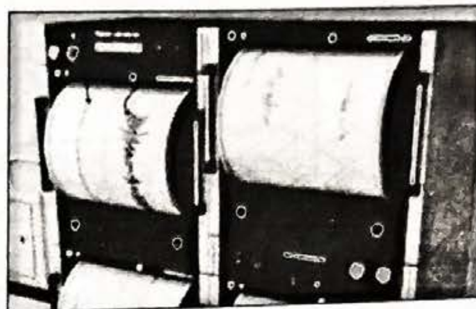

চিত্র : আধুনিক সিস্‌মোগ্রাফ

■ *পৃথিবীর ভেতর দিয়ে ভূকম্প তরঙ্গ সর্বত্র সমান গতিতে যেতে পারে কী?*

পৃথিবীর ভেতরের অবস্থা সর্বত্র সমান নয়। কোথাও কঠিন শিলা, কোথাও প্রচণ্ড গরম গলিত লাভা। আবার কোথাও খুব ভারী লোহা ও নিকেলের মতো পদার্থের সমাবেশ। ফলে ভূ-কম্পন তরঙ্গগুলি ভূ-অভ্যন্তরের সব জায়গা দিয়ে সমানভাবে, সমান গতিতে যেতে পারে না।

■ *ভূকম্প তরঙ্গ কয় ধরনের?*

ভূকম্প তরঙ্গ দু ধরনের, যেমন— দেহ তরঙ্গ ও পৃষ্ঠ তরঙ্গ।

■ *পৃষ্ঠ তরঙ্গ কী?*

পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠ বরাবর প্রসারিত হয়। এটি খুব বিধ্বংসী তরঙ্গ ও সবার শেষে গ্রাহক যন্ত্রে এসে পৌঁছায়। পৃষ্ঠ তরঙ্গের গতিবেগ সবচেয়ে কম। পৃষ্ঠ তরঙ্গকে সারফেস ওয়েভ্‌স বা এল-ওয়েভ্‌স (Surface Waves or L-Waves) বলে। পৃষ্ঠ তরঙ্গ দু-প্রকার যথা— র‍্যালে তরঙ্গ বা রেইলি তরঙ্গ (Rayleigh waves) এবং লাভ তরঙ্গ (Love Waves)

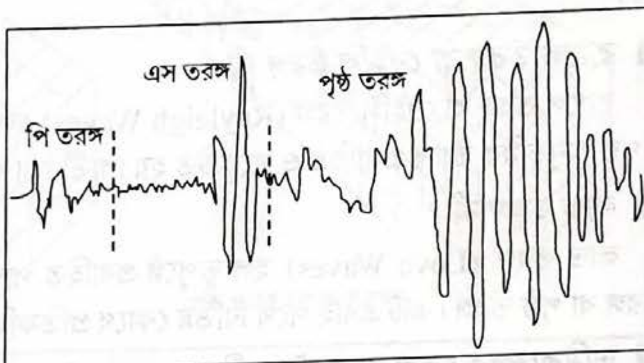

চিত্র : পি, এস ও পৃষ্ঠ তরঙ্গের রূপ

■ *দেহ তরঙ্গ কী?*

দেহ তরঙ্গ পৃথিবীর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়। দেহ তরঙ্গ দু-প্রকারের, যথা — পি-তরঙ্গ বা প্রাথমিক তরঙ্গ এবং এস-তরঙ্গ বা গৌণ তরঙ্গ। দেহ তরঙ্গকে বডি ওয়েভ্‌স (Body Waves) বলে।

■ *পি-তরঙ্গ কী?*

এটি খুব শক্তিশালী ভূকম্প তরঙ্গ। পৃথিবীর ভেতরের কঠিন, তরল, ভারী সব ধরনের স্তরের ভেতর দিয়ে পি-তরঙ্গ যেতে পারে। সবার আগে পি-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায় বলে একে প্রাইমারি ওয়েভ্‌স (Primary Waves) বা পি-তরঙ্গ বলে। এর গড় গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 6 কিলোমিটার। পি-তরঙ্গের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে তীব্র অনুভূমিক সংকোচন ও প্রসারণ হয়।

■ *এস-তরঙ্গ কী?*

এই তরঙ্গ পি-তরঙ্গের চেয়ে দুর্বল ও ধীরে যায়। এর গড় গতিবেগ সেকেন্ডে 3·5 কিলোমিটার। শুধু মাত্র পৃথিবীর কঠিন অংশের ভেতর দিয়েই এই তরঙ্গ যেতে পারে। গ্রাহক যন্ত্রে পি-তরঙ্গের পরে সেকেন্ডারি ওয়েভ্‌স (Secondary Waves) বা এস-তরঙ্গ এসে পৌঁছায়। এস-তরঙ্গকে গৌণতরঙ্গও বলে। এস-তরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের (Core) ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। এই তরঙ্গের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ লম্বভাবে ওপরে নীচে কাঁপতে থাকে।

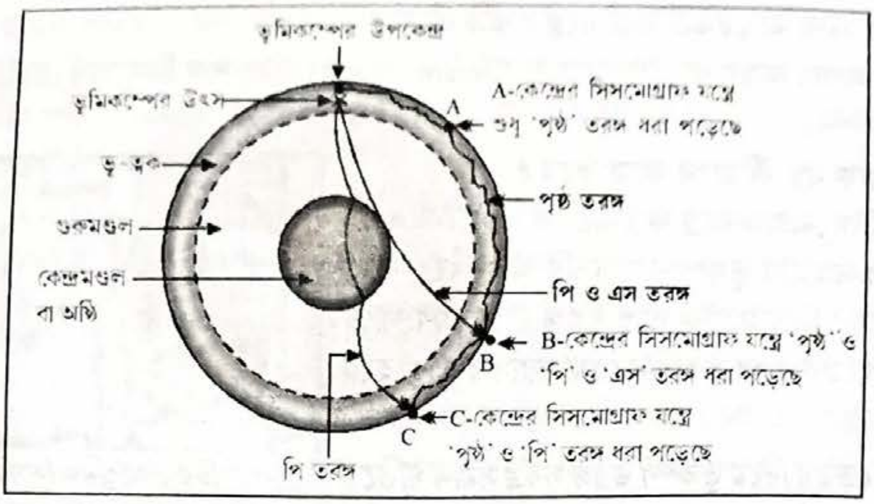

চিত্র : পৃথিবীর ভেতরে ভূকম্প তরঙ্গ যেভাবে প্রবাহিত হয় ও ভূপৃষ্ঠে বহিঃপ্রকাশ ঘটে

■ *দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সাপেক্ষে কোন্ ভূকম্পীয় তরঙ্গ বেশি ক্ষতিকর?*

দেহ তরঙ্গের (Body Waves) তুলনায় পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Surface Waves) বেশি ক্ষতিকর। পৃষ্ঠ তরঙ্গ মানুষ ও পরিবেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। কারণ পৃষ্ঠ তরঙ্গ মাটিতে দীর্ঘ ফাটল ধরায়। মাটির নীচে তেলের লাইন, গ্যাসের লাইন ভেঙে ফেলে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, সেতু ভেঙে পড়ে। নদী গতিপথ বদলে ফেলে। ভূপৃষ্ঠ কোথাও বসে যায় বা কোথাও উঁচু হয়ে যায়। অরণ্য ধ্বংস হয়। ধস নামে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়।

■ *র‍্যালে তরঙ্গ বা রেইলি তরঙ্গ কী?*

র‍্যালে তরঙ্গ বা রেইলি তরঙ্গ (Rayleigh Waves) হল এক ধরনের পি-তরঙ্গ। এই তরঙ্গের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ অনুভূমিক ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যালে তরঙ্গের গতি কমে।

■ *লাভ তরঙ্গ কী?*

লাভ তরঙ্গ (Love Waves) হল ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত পাশাপাশি ভাবে ঢেউ খেলানো এক প্রকার এস তরঙ্গ বা পৃষ্ঠ তরঙ্গ। এটি প্রবাহ পথে বিভিন্ন কোণে প্রতিফলিত হয়।

■ *ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা সেন্টার কী?*

ভূঅভ্যন্তরে যেখানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা সেন্টার বা ফোকাস (Centre or Focus) বলে। ভূকম্পের কেন্দ্র ভূগর্ভে 700 কিলোমিটার বা তার চেয়েও গভীরে সৃষ্টি হতে পারে।

■ *ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টার কী?*

ভূমিকম্পের কেন্দ্রের সরাসরি ওপরে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের স্থানটিকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টার (Epicentre) বলে।

■ *ভূকম্পের প্রতিপাদকেন্দ্র বা অ্যান্টিসেন্টার কী?*

ভূপৃষ্ঠে ভূকম্পের উপকেন্দ্রের ঠিক বিপরীত গোলার্ধে 180° কোণে অবস্থিত স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিপাদকেন্দ্র বা অ্যান্টিসেন্টার (Anticentre) বলে।

■ *আইসোসিসম্যাল রেখা কী?*

আইসোসিসম্যাল (Isoseismals) রেখা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের ঘটনার প্রেক্ষিতে ভূপৃষ্ঠে সমভূমিকম্পন-তীব্রতা বা সমভূমিকম্পন-মাত্রাবিশিষ্ট রেখাকে বোঝায়। সমভূকম্পন তীব্রতাবিশিষ্ট স্থানগুলিকে মানচিত্রে রেখা দিয়ে যোগ করলে আইসোসিসম্যাল রেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ আইসোসিসম্যাল রেখা হল সমভূকম্পন তীব্রতা রেখা বা সমভূবিপর্যয় তীব্রতা রেখা।

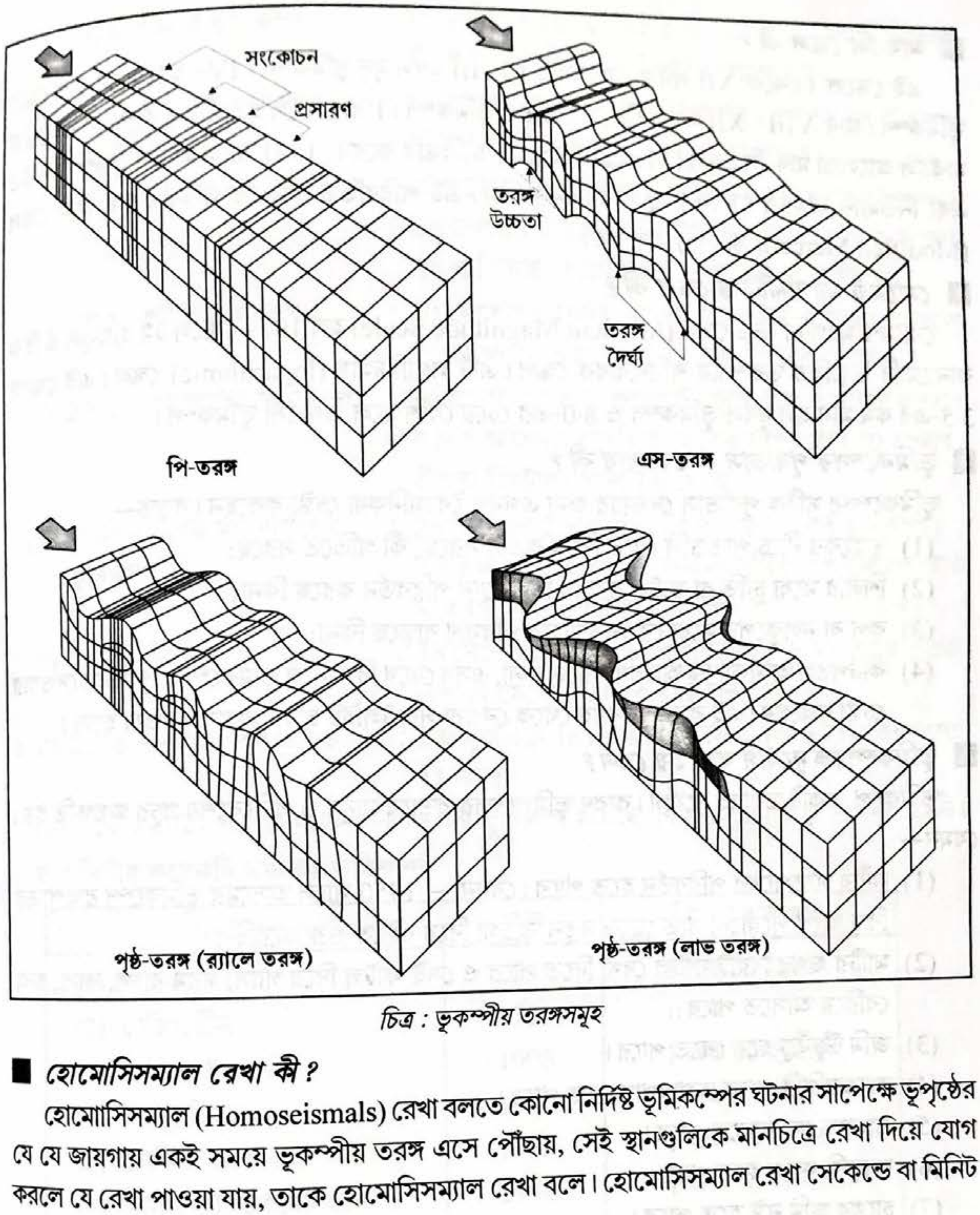

চিত্র : ভূকম্পীয় তরঙ্গসমূহ

■ *হোমোসিসম্যাল রেখা কী?*

হোমোসিসম্যাল (Homoseismals) রেখা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের ঘটনার সাপেক্ষে ভূপৃষ্ঠের যে যে জায়গায় একই সময়ে ভূকম্পীয় তরঙ্গ এসে পৌঁছায়, সেই স্থানগুলিকে মানচিত্রে রেখা দিয়ে যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাকে হোমোসিসম্যাল রেখা বলে। হোমোসিসম্যাল রেখা সেকেন্ডে বা মিনিট এককে দেখানো হয়।

■ *ভূমিকম্পের তীব্রতা কীভাবে মাপা হয়?*

ভূমিকম্পের মাত্রা বা তীব্রতা বা জোর মাপার জন্য তিনটি চালু স্কেল আছে। যথা— (1) রিখটার স্কেল, (2) মার্কালি স্কেল এবং (3) মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল।

■ *রিখটার স্কেল কী?*

1935 সালে মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ চার্লস রিখটার এই স্কেল আবিষ্কার করেন। এই স্কেলে 0 থেকে 10 পর্যন্ত ভাগ আছে। রিখটার স্কেলে (Richter Scale) 4·5 মান-এর বেশি ভূমিকম্প মানেই বেশ জোর ভূ-কম্পন হয়েছে বলে ধরতে হবে। আর 7 বা 7-এর বেশি মান হলে তা হবে তীব্র, সাংঘাতিক ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলের প্রতিটি মান তার আগের বা পূর্ববর্তী মানের কম্পন দৈর্ঘ্যের চেয়ে 10 গুণ বড়ো এবং 31·6 গুণ বেশি শক্তিশালী। রিখটার স্কেলের মান বা মাত্রা লগারিদমীয় (logarithmic)।

■ *মার্কালি স্কেল কী ?*

এই স্কেলে I থেকে XII পর্যন্ত ভাগ আছে। I–III মানে মৃদু ভূমিকম্প। IV–VII মানে বেশ জোর ভূমিকম্প। আর VIII–XII মানে তীব্র, সাংঘাতিক ভূমিকম্প। 1902 সালে ইতালীয় ভূকম্পবিদ গুইসেপ্পে মার্কালি আলোচ্য মার্কালি স্কেল (Mercalli Scale) আবিষ্কার করেন। 1931 সালে মার্কিন ভূকম্পবিদ উড এবং নিউম্যান মার্কালি স্কেলে কিছু পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তিত স্কেলকে পরিবর্তিত মার্কালি স্কেল (Modified Mercalli Scale) বলা হয়।

■ *মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল কী ?*

মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল (Moment Magnitude Scale) হল 1979 সোলে টম হ্যাংক্স ও হিরু কানামোরি উদ্ভাবিত ভূকম্পীয় শক্তিবোধক স্কেল। এটি লগারিদমীয় (logarithmic) স্কেল। এই স্কেলে 3·5-এর কম মান হল দুর্বল ভূমিকম্প ও 8·0-এর চেয়ে বেশি হলে বিধ্বংসী ভূমিকম্প।

■ *ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায় কী ?*

ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এখনও বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন। বস্তুত—

(1) ভূত্বকের নীচে পাতগুলি কোন্ দিকে কতটা সরছে, কী গতিতে সরছে;
(2) শিলার মধ্যে চ্যুতি বা ফাটল বরাবর শিলা স্থান পরিবর্তন করছে কিনা;
(3) কূপ বা নলকূপের মধ্যে রেডন গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে কিনা;
(4) কীটপতঙ্গ অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা, এসব দেখে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই কাজে উপগ্রহ থেকে নেওয়া স্যাটেলাইট ছবির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

■ *ভূমিকম্পকে দুর্যোগ বলা হয় কেন ?*

ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ দুর্যোগ। কারণ ভূমিকম্পের প্রভাবে মানুষ ও পরিবেশের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেমন—

(1) নদীর গতিপথের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন — 1950 সালে অসমের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের কিছু অংশ পুরোনো খাত ছেড়ে নতুন জায়গা দিয়ে বইতে শুরু করেছিল।
(2) মাটির ওপর বিরাট ফাটল দেখা দিতে পারে ও সেই ফাটল দিয়ে গ্যাস, গরম বাষ্প, কাদা, জল বেরিয়ে আসতে পারে।
(3) জমি উঁচুনীচু হয়ে যেতে পারে।
(4) আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে।
(5) পাহাড়ে ধস নামতে পারে।
(6) বনভূমি ধ্বংস হতে পারে।
(7) চাষের জমি নষ্ট হতে পারে।
(8) বাঁধ, জলাধার, সেতু, পথঘাট, রেললাইন, বড়ো বড়ো বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সামাজিক পরিকাঠামো ধ্বংস হতে পারে।
(9) বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে আগুন লাগতে পারে।
(10) মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে।
(11) গবাদিপশুর প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।

● **ভারতে কয়েকটি বড়ো ভূমিকম্পের ঘটনা :**

(1) 1887—**অসমের ভূমিকম্প** : ব্যাপক ধ্বংস, ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে 8·1।
(2) 1905—**কাংড়া ভূমিকম্প** : পাঞ্জাব ও সংলগ্ন এলাকার প্রায় 20 হাজার লোকের মৃত্যু। তীব্রতা রিখটার স্কেলে 7·8।

(3) 1934—**বিহার ভূমিকম্প** : 15 জানুয়ারি 1934। বিহার ও নেপালের বিশাল এলাকা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। তীব্রতা রিখটার স্কেলে 8·7।

(4) 1950—**অসমের ভূমিকম্প** : 15 আগস্ট 1950। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ব্রহ্মপুত্র নদ গতিপথ পরিবর্তন করে। তীব্রতা রিখটার স্কেলে 8·5।

(5) 1991—**উত্তরকাশীর ভূমিকম্প** : 20 অক্টোবর 1991। রিখটার স্কেলে 6·1 তীব্রতার ভূমিকম্প। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী, চামোলি এবং তেহরি ও সংলগ্ন অঞ্চল বিধ্বস্ত। 1,000-এর বেশি লোক প্রাণ হারান।

(6) 1993—**লাটুর ভূমিকম্প** : 30 সেপ্টেম্বর 1993। মহারাষ্ট্রের লাটুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তীব্রতা রিখটার স্কেলে 6·2।

(7) 2001—**গুজরাটের ভূমিকম্প** : 26 জানুয়ারি 2001। গুজরাটের ভুজ, কচ্ছ ও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মৃতের সংখ্যা প্রায় 20 হাজার। তীব্রতা রিখটার স্কেলে 7·6 থেকে 7·7।

(8) 2004—**ভারত মহাসাগরের ভূমিকম্প** : 26 ডিসেম্বর 2004। পৃথিবীর তৃতীয় ভয়ংকর ভূমিকম্প। ভারত মহাসাগরে বিধ্বংসী সুনামির সৃষ্টি হয়। শুধু মাত্র ভারতে মৃতের সংখ্যা 15 হাজার।

(9) 2011—**সিকিম** : 18 সেপ্টেম্বর 2011। উত্তর-পূর্ব ভারত। ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে 6·9। মৃত 111 জন।

(10) 2016 — **উত্তর-পূর্ব ভারত** : 3 জানুয়ারি 2016। রিখটার স্কেলে তীব্রতা 6·7। মৃতের সংখ্যা 11 জন।

2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে একাধিক বার ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু কোনো বড়ো বিপর্যয় হয়নি।

- **পৃথিবীর কয়েকটি ভয়ংকর ভূমিকম্প**

স্থান	সাল	নিহতের সংখ্যা
(1) সানসি, চিন	1556	8 লক্ষ 30 হাজার
(2) বেজিং, চিন	1731	1 লক্ষ
(3) মেসিনা, ইতালি	1908	1 লক্ষ 60 হাজার
(4) গনজু, চিন	1920	1 লক্ষ 80 হাজার
(5) টোকিও, জাপান	1923	1 লক্ষ 43 হাজার
(6) আসগাবাট, তুর্কমেনিস্তান	1948	1 লক্ষ 76 হাজার
(7) আনকাশ, পেরু	1970	74 হাজার
(8) তিয়েনশান, চিন	1976	1 লক্ষ 40 হাজার
(9) রুদবার, ইরান	1990	40 হাজার
(10) উত্তর তুরস্ক	1990	45 হাজার
(11) সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া	2004	1 লক্ষ 40 হাজার
(12) সিচুয়ান, চিন	2008	69 হাজার
(13) হাইতি	2010	3 লক্ষ 16 হাজার
(14) নেপাল	2015	22 হাজার
(15) ইন্দোনেশিয়া	2019	4,340 জন
(16) আলাস্কা	2020, 2021	139 জন

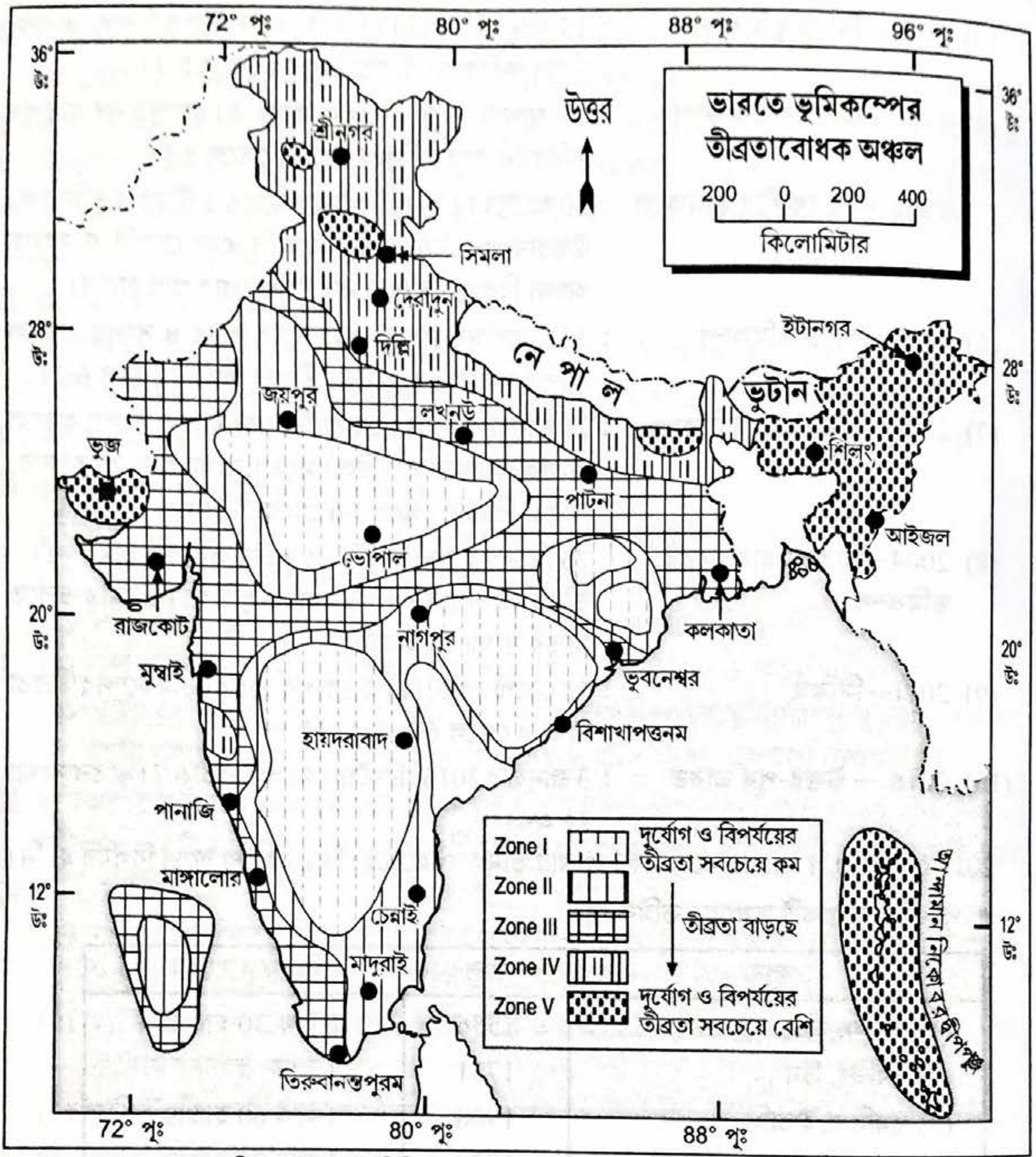

চিত্র : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্পের বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব

8.4 ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন (Cyclone)

■ ***সাইক্লোন বা ঘূর্ণবাত কাকে বলে?***

কোনো জায়গায় বায়ুর চাপ কমার ফলে নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে সজোরে ছুটে আসা ঘূর্ণির মতো কুণ্ডলী আকৃতির প্রচণ্ড গতির অস্থিতিশীল বায়ুপ্রবাহকে সাইক্লোন (Cyclone) বা ঘূর্ণবাত বলে। ঘূর্ণবাতের বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রচণ্ড। কয়েকশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তাঘাট, রেললাইন সব দুমড়ে-মুচড়ে তছনছ করে দিতে পারে এই সাইক্লোন। পৃথিবীর ক্রান্তীয় এলাকায় সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এবং ইউরোপ, আমেরিকায় শীতকালে ঘূর্ণবাত দেখা যায়।

■ ***ইংরেজি সাইক্লোন কথাটির উৎপত্তি কী?***

গ্রিক শব্দ Kukloma থেকে ইংরেজি cyclone (সাইক্লোন) কথাটি এসেছে। যার অর্থ হল সর্পিল কুণ্ডলী আকৃতি।

■ ***ঘূর্ণবাতে বায়ু কোন্ দিকে ঘোরে?***

করিওলিস বলের (coriolis force) প্রভাবে ঘূর্ণবাতগুলির কেন্দ্রের দিকে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা বাতাস উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে।

চিত্র : ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন

■ ***পৃথিবীর কোথায় কোথায় ঘূর্ণবাত বেশি হয়?***

(1) ভারত, (2) বাংলাদেশ, (3) ফিলিপিন্‌স, (4) চিন, (5) জাপান, (6) ওয়েস্ট ইন্ডিজ, (7) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (8) মেক্সিকো, (9) অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ক্রান্তীয় অঞ্চল ও তার কাছাকাছি এলাকার দেশগুলিতে ঘূর্ণবাত বেশি হয়।

■ ***ঘূর্ণবাতের বিভিন্ন স্থানীয় নাম কী?***

ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—

(1) ওয়েস্ট ইন্ডিজে **হারিকেন (Hurricane)**

(2) চিন সাগরে **টাইফুন (Typhoon)**

(3) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **টর্নেডো (Tornado)**

(4) উত্তর ভারতে **আঁধি (Andhi)** ইত্যাদি।

■ ***ঘূর্ণবাত কয় ধরনের?***

আঞ্চলিক অবস্থান ও ঘূর্ণবাতের প্রকৃতি অনুসারে ঘূর্ণবাত দু'ধরনের যেমন— (1) ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত, ও (2) নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত।

■ ***ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত কী?***

নিরক্ষরেখার উভয়দিকে 5° থেকে 30° অক্ষাংশের মধ্যে যে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (Tropical cyclone) বলে। ভারত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের দেশ।

■ ***নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত কী?***

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের 35° থেকে 65° অক্ষাংশের মধ্যে যে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয় তাকে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত বা তরঙ্গ ঘূর্ণবাত (Temperate cyclone or Wave cyclone) বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন হল নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের দেশ।

■ ***ঘূর্ণবাতের নামকরণ কে করে?***

ঘূর্ণবাতকে সহজে চেনার জন্য ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেসন (World Meteorological Organization সংক্ষেপে WMO) ঘূর্ণবাতের নামকরণ করে। এবিষয়ে আঞ্চলিক কমিটি আছে। তারা ওই অঞ্চলের জন্য নামের তালিকা প্রস্তুত করে। যেমন— উত্তর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের জন্য বাংলাদেশের দেওয়া নাম হল হেলেন, মালদ্বীপের দেওয়া নাম হল আয়লা, ওমানের দেওয়া নাম হল হুদহুদ, পাকিস্তানের দেওয়া নাম নিলোফার ইত্যাদি। ভারত-ও ঘূর্ণবাতের নামকরণ করে। যেমন— ভারতের দেওয়া নামের তালিকায় আছে — অগ্নি, আকাশ, বিজলি, জল, লহর ইত্যাদি।

■ ***সব ঘূর্ণবাত কী একই ধরনের?***

সব ঘূর্ণবাতই একই ধরনের নয়। অবস্থান বা উৎপত্তির জায়গা অনুসারে যেমন ঘূর্ণবাতগুলি ক্রান্তীয় বা নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির, তেমন ঝড়ের গতিবেগ অনুসারেও ঘূর্ণবাতেরা বিভিন্ন শ্রেণির।

ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সংক্ষেপে IMD ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতকে ঝড়ের গতিবেগ অনুসারে চার ভাগে ভাগ করেছে, যেমন—

ঘূর্ণবাতের শ্রেণি	ঝড়ের গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা)	ক্ষয়ক্ষতি	উদাহরণ
সাধারণ ঘূর্ণিঝড়	62–88	ক্ষতিকারক	মহাসেন (2013 সাল) কোমেন (2015 সাল)
প্রবল ঘূর্ণিঝড়	89–117	ব্যাপক ক্ষতিকারক	হেলেন (2013 সাল)
অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়	118–220	বিধ্বংসী	হুদহুদ (2014 সাল) ফনি (2019 সাল)
সুপার সাইক্লোন	220-র বেশি	অত্যন্ত বিধ্বংসী	ওড়িশা সুপার সাইক্লোন (1999 সাল); আমফান (2020 সাল);

■ ***সাইক্লোনকে দুর্যোগ বলে মনে করা হয় কেন?***

সাইক্লোনকে দুর্যোগ বলে মনে করার কারণ হল :

(1) বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাইক্লোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণবাত বিপর্যয় ডেকে আনে। মানুষের ধনসম্পদের ক্ষতি করে। মানুষের বসতবাড়ি ভেঙে মানুষকে গৃহহারা করে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। যেমন —

নাম	সাল	যে সামুদ্রিক এলাকায় উৎপত্তি	মৃতের সংখ্যা
(i) ভোলা সাইক্লোন, বাংলাদেশ	1970	বঙ্গোপসাগর	3 লক্ষ–5 লক্ষ
(ii) সুপার টাইফুন নিনা, চিন	1975	পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	1 লক্ষ 71 হাজার
(iii) সাইক্লোন নার্গিস, মায়ানমার	2008	বঙ্গোপসাগর	1 লক্ষ 38 হাজার

সাম্প্রতিক কালে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বারবার ঘূর্ণবাতের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু হাজার কোটি টাকার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

(2) ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেমে যাওয়ার পর পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। কারণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত পশুপাখি, মানুষের মৃতদেহ জলকে দূষিত করে তোলে।

(3) দূষিত জলের প্রভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং বহুলোকের প্রাণহানি হয়।

(4) ঘূর্ণবাতের ফলে একদিকে যেমন প্রচুর গাছপালার ক্ষতি হয় ফলে পশুপাখিরা তাদের স্বাভাবিক আশ্রয় হারায়, তেমনই ছোটো ছোটো তৃণভোজী বা মাংসাশী প্রাণীর মৃত্যুর ফলে বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হয়। শক্তিপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

■ ***ঘূর্ণবাত বা ঘূর্ণিঝড় কেন হয়?***

ঘূর্ণবাত বা ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার প্রাথমিক কারণ হল, ভূপৃষ্ঠের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড তাপের ফলে আকাশে ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘের মধ্যে উর্ধ্বমুখী গরম বাতাস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উঠতে থাকে এবং "অ্যাডিয়াবেটিক" পদ্ধতিতে শীতল হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের ওপর নিম্নচাপ বরাবর মেঘের মধ্যে উর্ধ্বমুখী গরম বাতাস জোগান দেওয়ার এলাকাটি বেশ ছড়ানো থাকে। এই ভাবে মেঘের মধ্যে আলোড়ন যত বাড়তে থাকে, উর্ধ্বমুখী টানও তত বৃদ্ধি পায় এবং মেঘের মধ্যে ঘূর্ণি বাতাসের একটি দারুণ ক্ষমতাশালী নল তৈরি হয়। দূর থেকে একে হাতির শুঁড়ের মতো দেখায়।

■ *ঘূর্ণবাত বা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের উপায় কী?*

ঘূর্ণবাতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়। এর জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল—

(1) ঘূর্ণবাত বা ঘূর্ণিঝড় আসার আগে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। এর জন্য উপগ্রহ মারফত খবরাখবর আদানপ্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

(2) ঝড়ের আগে লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানোর জন্য একাধিক শিবির গড়ে তোলা হয়।

(3) ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি সাহায্য ও ব্যাংকের তরফে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়।

■ *আমফান কী?*

আমফান হল একটি মহাশক্তিশালী এবং এখনও পর্যন্ত আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বা সুপার সাইক্লোন। পূর্ব ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ও প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশ-এ আমফান প্রবল ক্ষয়ক্ষতি করেছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় 10 লক্ষ কোটি টাকা (13·7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

■ *আমফান শব্দের মানে কী?*

আমফান মানে আকাশ। আমফান কথাটির প্রকৃত উচ্চারণ হল "উম্-পুন" (Um-pun)। এটি থাইল্যান্ডের দেওয়া নাম। আমফান একটি থাই শব্দ, যার অর্থ আসমান বা গগন বা স্কাই (sky)।

■ *আমফান ঝড় কবে এসেছিল? এর উৎপত্তি কোথায়?*

আমফান নামের প্রবল ঝড়টি 2020 সালে 16 মে জন্ম নেয় ও 21 মে শেষ হয়ে যায়। তামিলনাড়ু ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী বঙ্গোপসাগরে আমফানের সৃষ্টি হয়।

■ *আমফান কেন সৃষ্টি হয়েছিল?*

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে আমফান সৃষ্টির অনুকূল কারণ ছিল —

(i) 2020-র মে মাসে বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠস্তর বা ওপরের জলস্তরের তাপমাত্রার পরিমাণ ছিল 32°–34° সেলসিয়াস (যেখানে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা থাকে 28°–28·6° সে.)।

(ii) বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। বঙ্গোপসাগর তার কোনো ব্যতিক্রম নয়। তাই পৃষ্ঠ জলস্তরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়েছে।

(iii) আলোচ্য সময়ে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের বায়ুতে এরোসল (aerosol)-এর পরিমাণ কম ছিল। এরোসল বেশি হলে মেঘ ও হালকা বৃষ্টি হয়। ফলে ঝড়ের তীব্রতা কমে যায়।

■ *সাম্প্রতিককালে ধ্বংস ক্ষমতায় আমফানের সমকক্ষ আর কোন্ কোন্ তীব্র ঝড় এর আগে বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জন্মেছে?*

(i) ওড়িশা সুপার সাইক্লোন — 25 অক্টোবর থেকে 3 নভেম্বর, 1999 (ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে)।

(ii) সিদর — 11 নভেম্বর থেকে 16 নভেম্বর, 2007 (বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে)।

(iii) নার্গিস — 27 এপ্রিল থেকে 3 মে, 2008 (মায়ানমারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে)।

(iv) ফনি — 26 এপ্রিল থেকে 5 মে, 2019 (ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে)।

■ *আমফান ঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুচাপ কত নেমেছিল?*

আমফান ঝড়ের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ নেমেছিল 920 মিলিবার। যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপের স্বাভাবিক পরিমাণ হল 1013·25 মিলিবার।

■ *আমফান ঝড়ে বায়ুর সর্বোচ্চ গতিবেগ কত ছিল?*

আমফান ঝড়ে বায়ুর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল —

(i) একটানা এক মিনিটের গড় প্রতি ঘণ্টায় 260 কিলোমিটার।

(ii) একটানা তিন মিনিটের গড় প্রতি ঘণ্টায় 240 কিলোমিটার।

■ *ক্রান্তীয় ঝড়ের তীব্রতা অনুসারে আমফান ঝড় কোন্ ধরনের?*

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বা ক্রান্তীয় ঝড়ের তীব্রতার স্কেল অনুযায়ী

(i) আমফান হল সুপার সাইক্লোন (কারণ BMD স্কেল অর্থাৎ বাংলাদেশ মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট স্কেল অনুযায়ী যে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 222 কিলোমিটার বা তার বেশি তাকে সুপার সাইক্লোন বলে)।

(ii) আমফান হল সাফির-সিম্পসন (Saffir-Simpson) স্কেল অনুযায়ী "ক্যাটিগরি 5" ধরনের বা "ক্যাটিগরি 5" বর্গের ঘূর্ণবাত (কারণ ক্যাটিগরি 5 বর্গের ঘূর্ণবাতের গড় গতিবেগ হয় ঘণ্টায় 250 কিলোমিটার বা তার বেশি)।

■ *ভারত ছাড়া আর কোন্ কোন্ দেশ আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?*

ভারত ছাড়া আর যে সমস্ত দেশ আমফান ঝড়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি হল বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।

■ *ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে আমফান ক্ষতি করেছে?*

আমফানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

■ *পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আমফানের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে?*

পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর 24-পরগনা, দক্ষিণ 24-পরগনা, কলকাতা, হুগলি ও হাওড়া জেলায় আমফান ঝড়ে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

■ *আমফান থেকে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?*

আমফান ঝড়ের গতিপথে ভারত ও বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় চার কোটি মানুষের বাস। এছাড়া শহর, নগর, বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রয়েছে রেলপথ, সড়কপথ, এবং আরও বহু লক্ষ কোটি টাকার নাগরিক বন্দোবস্ত। এই সম্পদগুলির ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক স্তরে নানান ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ 15 মে, 2020 থেকেই শুরু হয়ে যায়। এদের মধ্যে অন্যতম হল —

(i) ওড়িশার পারাদ্বীপ ও কলকাতা নৌবন্দরের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ রাখা হয়।

(ii) কলকাতায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 21 মে পর্যন্ত উড়ান বন্ধ রাখা হয়।

(iii) শ্রমিক ট্রেন, এসি এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয় বা থামিয়ে রাখা হয়।

(iv) ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF)-কে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে মোতায়েন করা হয়।

(v) ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 20 লক্ষ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। শুধু সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয় প্রায় 50 হাজার মানুষকে। এতৎসত্ত্বেও আমফান ঝড়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় 128 জন।

(vi) রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আমফান ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।

8.5 সুনামি (Tsunami)

■ *সুনামি কাকে বলে?*

জাপানি ভাষায় সু (Tsu) মানে হল বন্দর, নামি (nami) মানে ঢেউ। এক কথায় সুনামির অর্থ হল মহাশক্তিশালী সামুদ্রিক ঢেউ। সুনামির ঢেউ-এর শক্তি এত বেশি যে এর ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয় এক নিমেষে, চোখের পলকে।

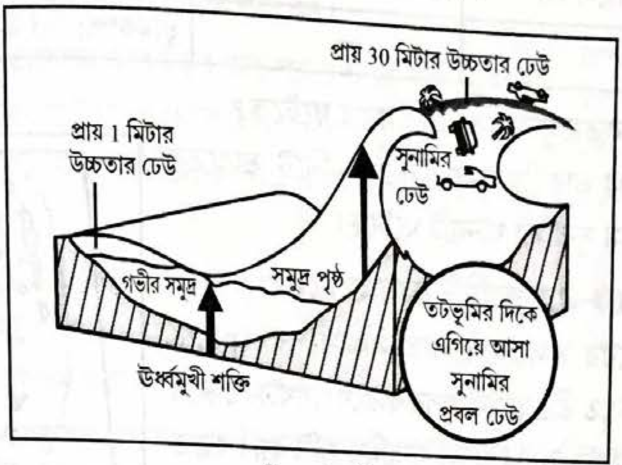

চিত্র : সুনামি

■ *সুনামি ঘটার সম্ভাবনা পৃথিবীতে কোথায় সবচেয়ে বেশি?*

পৃথিবীর সবচেয়ে সুনামিপ্রবণ অঞ্চল হল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ও সংলগ্ন এলাকা। জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে সুনামিপ্রবণ দেশ। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সুনামির ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি হল ফিলিপিন্‌স, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ইটালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (অ্যালুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই এবং আলাস্কা), রাশিয়া (কুরিল দ্বীপপুঞ্জ), চিলি, পাপুয়া-নিউগিনি ইত্যাদি।

● পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুনামির ঘটনা :

সাল	দেশ / অঞ্চল	মৃতের সংখ্যা (প্রায়)	কারণ
1792	জাপান	15,000 জন	কিউসু দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত
1868	উত্তর-চিলি	70,000 জন	ভূমিকম্প
1883	ইন্দোনেশিয়া	36,000 জন	ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
1896	জাপান (সানরিকু)	26,000 জন	ভূমিকম্প
1908	ইটালি (মেসিনা)	1,23,000 জন	ভূমিকম্প
1958	লিটুয়া উপসাগর (আলাস্কা)	—	ভূমিকম্প। মেগাসুনামি। উচ্চতম সুনামির ঢেউ — উচ্চতা 1720 ফুট (524)মি.।
1980	স্পিরিট হ্রদ (ওয়াশিংটন)	—	সেন্ট হেলেন্‌স আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। মেগাসুনামি। ঢেউ-এর উচ্চতা 853 ফুট (260মি.)
2004	ভারত মহাসাগরের উপকূল	2,83,000 জন	ভূমিকম্প
2007	সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	5000 জন (গৃহহারা)	ভূমিকম্প
2011	জাপান	18,500 জন মৃত অথবা নিখোঁজ (ফুকুসিমা আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে বিপর্যয়)	ভূমিকম্প

সাল	দেশ / অঞ্চল	মৃতের সংখ্যা (প্রায়)	কারণ
2016	দক্ষিণ দ্বীপ, নিউজিল্যান্ড	2 জন	ভূমিকম্প; 7·8 তীব্রতা
2018	মিনাহাসা, ইন্দোনেশিয়া	4,340 জন	ভূমিকম্প; 7·5 তীব্রতা
2019	মালাক্কা প্রণালী, ইন্দোনেশিয়া	832 জন	ভূমিকম্প; 7·1 তীব্রতা
2020	সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া	—	ভূমিকম্প; 9·3 তীব্রতা
2021	পূর্ব ইন্দোনেশিয়া	—	ভূমিকম্প; 7·3 তীব্রতা

■ ***ভারতে সাম্প্রতিকতম সুনামির ঘটনা কবে ঘটেছে?***

26 ডিসেম্বর 2004 ভারতীয় সময় 6টা 28 মিনিটে ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রতিকতম সুনামির ঘটনাটি ঘটেছে।

■ ***26 ডিসেম্বর 2004-এর সুনামিটি কেন হয়েছে?***

ভারত মহাসাগরের তলদেশে পাত সঞ্চারণের (plate movement) ফলে উদ্ভূত তীব্র ভূমিকম্পের কারণে (রিখটার স্কেলে তীব্রতা 9·3) 26 ডিসেম্বর 2004 প্রবল সুনামির সৃষ্টি হয়। বস্তুত ভারত মহাসাগরে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের খুব কাছে বার্মা পাতের (বার্মা প্লেট) নীচে ভারতীয় পাত (ইন্ডিয়ান প্লেট) বেশ খানিকটা ভূগর্ভে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে প্রায় 1,200 কিলোমিটার দীর্ঘ সামুদ্রিক এলাকা জুড়ে বার্মা পাতের ক্ষতি হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় এই পাতটির অনেকটা ভেঙে গেছে। এ কারণে সুমাত্রা সংলগ্ন ভারত মহাসাগরে তীব্র ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং এই ভূমিকম্পের অভিঘাতে ভারত মহাসাগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অতি দ্রুত ধাবমান সুনামি। যার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় কমপক্ষে 800 কিলোমিটার।

চিত্র : 2004 সালের সুনামি – বার্মা প্লেটের নীচে ইন্ডিয়ান প্লেটের অধোগমন

■ ***26 ডিসেম্বর 2004-এর সুনামির প্রকৃতি ও ফলাফল কী?***

(1) বিগত 50 বছরে ভারত মহাসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে এত প্রবল সুনামি আর হয়নি।

(2) হিরোসিমায় যে আণবিক বোমাটি পড়েছিল, তেমন 9,500টি আণবিক বোমা এক জায়গায় ফাটলে যে শক্তি নির্গত হয় তার সমান প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়েছিল এই 26 ডিসেম্বরের ভূমিকম্পে—যার ফলে প্রবল সুনামির সৃষ্টি হয়।

(3) ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচে অঞ্চলে কমপক্ষে 25 শতাংশ মানুষ সুনামির প্রভাবে প্রাণ হারায়।

(4) এই সুনামির কারণে প্রায় দুলক্ষ তিরাশি হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ।

(5) মৃত মানুষজনের মধ্যে অধিকাংশই শিশু ও স্ত্রীলোক। গড়ে প্রতি 3 জনের মধ্যে 1 জন হল শিশু। ভারতে মৃতের সংখ্যা 10 হাজারের বেশি, শ্রীলঙ্কায় 38 হাজারের বেশি এবং ইন্দোনেশিয়াতে মৃতের সংখ্যা প্রায় 1 লক্ষ 74 হাজার জন।

(6) সুমাত্রা দ্বীপটি তার পুরাতন অবস্থান থেকে প্রায় 25 মিটার সরে গেছে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

(7) বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুসারে এই প্রবল ভূমিকম্প ও সুনামির প্রভাবে দিনের দৈর্ঘ্য (24 ঘণ্টা থেকে) কমে গেছে 3 মাইক্রো সেকেন্ড।

■ *সুনামি প্রতিরোধ করা যায় কী?*

সুনামি একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। একে বন্ধ করা যায় না। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও পূর্বাভাস ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনামির প্রভাবে ধ্বংসের পরিমাণ কমানো যায়।

(1) সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেম গড়ে তোলা হয়।

(2) সুনামির ঢেউ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুনামিপ্রবণ উপকূল অঞ্চলে প্রায় 4·5 মিটার উঁচু সুনামি পাঁচিল (Tsunami wall) নির্মাণ করা হয়।

(3) সুনামিপ্রবণ এলাকায় জীবজন্তুর আচরণের ওপর লক্ষ রাখা হয়। ভূমিকম্পের ঘটনার পর যদি দেখা যায় জীবজন্তু উপকূল থেকে ক্রমাগত দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সুনামি আসার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করা হয়। লোকজনও একইভাবে সমুদ্র থেকে দূরে নিরাপদ উঁচু জায়গায় সরে যেতে পারে।

(4) সুনামির প্রথম ঢেউ চলে গেলেই সুনামি শেষ হয় না। পরবর্তী ঢেউ পাঁচ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরেও আসতে পারে। সেজন্য লোকজনের নিরাপদ উঁচু জায়গা থেকে নেমে আসার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার হয়।

আধুনিক উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে সুনামির আগাম বার্তা বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা যায়, তা সংশ্লিষ্ট ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

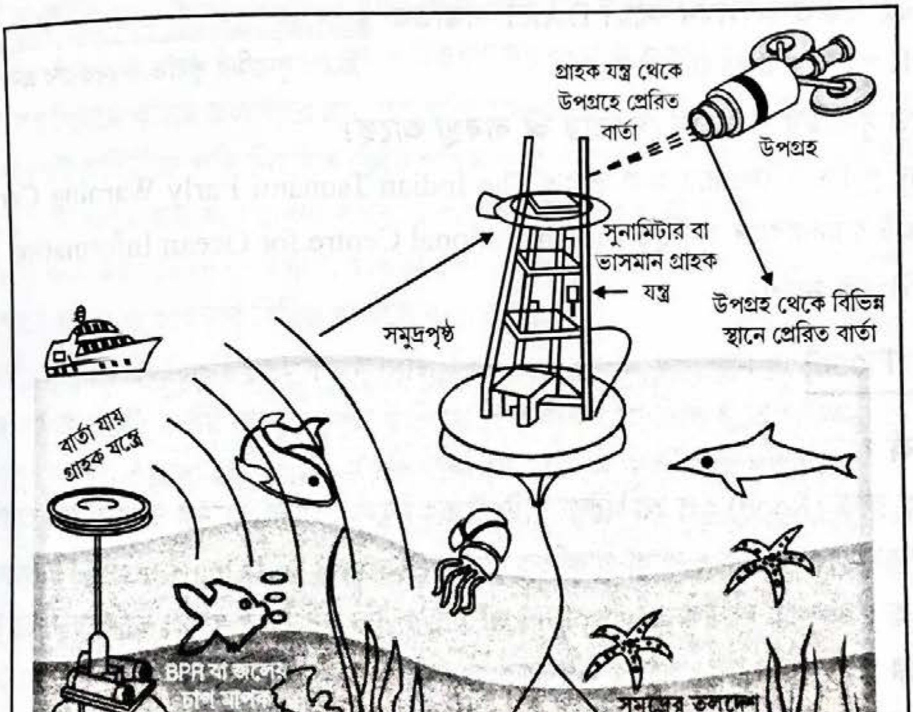

চিত্র : সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার পদ্ধতি

■ *সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেম কী?*

সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেম (Tsunami Warning System সংক্ষেপে TWS) হল কোনো সুনামি কোথাও সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা জানা এবং ওই সুনামি থেকে প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সাবধান করার ব্যবস্থা।

TWS-এর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি হল সুনামির ঘটনা ঘটছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক নজর রাখার উদ্দেশ্যে বহু সেনসর (sensor) স্থাপন করা হয়। এই সেনসরগুলি পরস্পর তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থার

মাধ্যমে সংযুক্ত (communication network) থাকে। দ্বিতীয়টি হল উপকূল এলাকা থেকে লোকজন সরিয়ে নেওয়া এবং অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তথ্য সংযোগ ব্যবস্থা।

■ *সুনামিটার কী ?*

সুনামিটার (Tsunameter) যন্ত্রের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে সুনামির সৃষ্টি হয়েছে কিনা জানা যায়।

■ ***BPR কী ?***

BPR এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম হল বটম প্রেসার রেকর্ডার (Bottom Pressure Recorder)। BPR পদ্ধতি ও BPR যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে জলচাপের পার্থক্য ঘটছে কিনা জানা যায়। কারণ জলে ঢেউ উঠলে জলের চাপের পার্থক্য হয়। সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে BPR-এর বিশেষ ভূমিকা আছে। জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় BPR যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

■ ***DART কী ?***

DART এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম হল ডিপ-ওশন অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড রিপোর্টিং অব সুনামি (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami)। এটি সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। DART পদ্ধতিও মূলত BPR পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

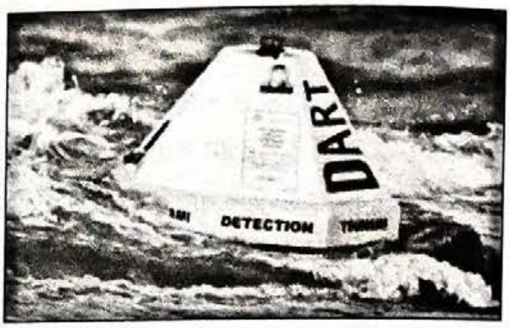

চিত্র : সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য DART যন্ত্র

■ *ভারতে সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার কী ব্যবস্থা আছে?*

সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ভারত The Indian Tsunami Early Warning Centre স্থাপন করেছে। এটি হায়দরাবাদে অবস্থিত Indian National Centre for Ocean Information Sciences (INCOIS)-এর অধীন।

8.6 বন্যা (Flood)

■ *বন্যা কী ?*

বন্যা বা ফ্লাড (flood) হল অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো স্থানের জলমগ্নতার অবস্থা। প্রকৃতি অনুসারে বন্যা হল প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural and Quasi-natural hazard)। একই সঙ্গে বন্যা হল জলগত দুর্যোগ (Hydrological hazard)। নদী তার দু'কূল ছাপিয়ে যখন চারপাশকে জলমগ্ন করে তখন বন্যা হয়। আবার নদীখাতে স্বাভাবিক জলপ্রবাহের তুলনায় জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বন্যা হয়।

■ *বন্যা কয় ধরনের?*

বন্যা পাঁচ ধরনের, যেমন—

(1) পাহাড়ি এলাকায় হড়পা বান (flash flood)

(2) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় জোয়ারের কারণে বন্যা (tidal flood),

(3) অতিরিক্ত বর্ষণের কারণে বন্যা (hydro-meterological flood),

(4) নগর অঞ্চলে শহরী বন্যা বা আরবান ফ্লাড (urban flood)।

(5) বাঁধ ভেঙে পড়ার কারণে বন্যা (dam failure flood)।

বন্যার প্রাকৃতিক কারণ কী?

(1) অতিরিক্ত এবং একটানা প্রবল বর্ষণের কারণে বন্যা হয়।

(2) ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীতে ক্রমাগত পলি জমা হওয়ার জন্য নদীর গভীরতা কমে গেলে অর্থাৎ নদীখাতের জলধারণ ক্ষমতা কমে গেলে বন্যা হয়।

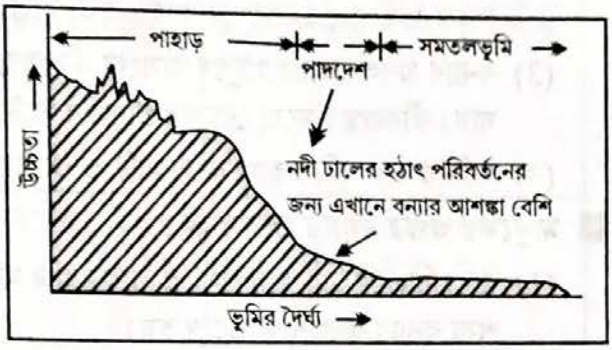

চিত্র : নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর ঢালের পরিবর্তনের ফলে বন্যা

(3) পাহাড় থেকে সমতলে নামার সময়ে নদীখাতের ঢাল খাড়াই থেকে হঠাৎ মৃদু ঢালে পৌঁছে গেলে পাহাড়ের পাদদেশে বন্যা হয়।

(4) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও তীব্রতার (intensity) ধরনে বদল ঘটে। ফলে বন্যার ঘটনা বাড়ে।

মানুষ কীভাবে বন্যা সৃষ্টি করে?

(1) পাহাড়ি এলাকায় অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অতিরিক্ত বনহনন বা গাছ কেটে ফেলার জন্য ভূমিক্ষয় বাড়ে। ফলে নদীখাতে পলি জমে নদী গভীরতা হারায় ও অল্প বৃষ্টিতেই নদীতে বন্যা হয়। উদাহরণ— উত্তরবঙ্গের বন্যা বা অসমের বন্যা।

(2) বাঁধের পিছনে কৃত্রিম জলাধারে ক্রমাগত পলি জমা হওয়ার ফলে বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ওই অতিরিক্ত পলি নিয়মিত কেটে পরিষ্কার না করলে, ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন বর্ষায় জল ধরে রাখার পরিবর্তে বাঁধ কর্তৃপক্ষ বাঁধ বাঁচাতে জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে বন্যা হয়। যেমন— হুগলি, হাওড়া জেলার বন্যা। দামোদরে জল ছাড়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুগলি ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

(3) নদীর দুপাশে অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি, শিল্প, চাষের জমি, চা বাগান গড়ে তোলার ফলে নদী স্বাভাবিকভাবেই বর্ষায় যতদূর দুকূল ছাপিয়ে বিনা বাধায় প্রসারিত হতে পারত, এখন আর তা পারে না। ফলে বন্যা হয়। যেমন— জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, মুরশিদাবাদের বন্যা।

(4) গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিগুলিকে বুজিয়ে ফেলার জন্য বর্ষার জল ওই নীচু জমিতে আর জমা হওয়ার সুযোগ পায় না। তাই বন্যা হয়। যেমন, কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ক্রমশ ভরাট করা হয়েছে, কিন্তু খালগুলির সংস্কার এখনও বাকি আছে। কলকাতাসহ উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা ও সন্নিহিত অঞ্চলে তাই বন্যা হয়।

(5) বড়ো বাঁধে ফাটল দেখা দিলে বা বড়ো বাঁধ ভেঙে পড়লে বন্যা হয়, যেমন —

(i) ব্রাজিলের মিনাস গেরাইস অঞ্চলে 2019 সালে ব্রুমাডিনহো (Brumadinho) বাঁধ ভেঙে বন্যা হয়। 270 জন মানুষ মারা যায়।

(ii) চিনের হেনান প্রদেশে 1975 সালে বানকিয়াও (Banquao) বাঁধ ভেঙে পড়ে। ফলে 1,71,000 জন মানুষ মারা যায়। প্রায় 1·1 কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(iii) 2008 সালে বিহারের বন্যা। কারণ কোশী নদীর বাঁধে ভাঙন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর বন্যার প্রভাব কী?

(1) বন্যার জলে ছোটো ছোটো গাছপালা ও শস্য বিশেষত ধান, গম, শাকসবজি চাষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্যার প্রকোপে এইসব নরম গাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়।

(2) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়। পাতা ঝরে যায়, শিকড় পচে যায়, ফলে উৎপাদক স্তরে সবুজ গাছপালার জোগান ব্যাহত হয়। বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়। খাদ্যশৃঙ্খল নষ্ট হয়।

(3) বন্যার প্রবল স্রোতের মুখে অসংখ্য জীবজন্তু প্রতি বছর ভেসে যায় এবং খাদ্যের অভাবে মারা যায়। জীবজন্তুর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

(4) মাটি ও জল দূষিত হয়। ফলে মাটি ও জলের গুণগত মান (quality) কমে যায়।

■ ***মানুষের ওপর বন্যার প্রভাব কী?***

(1) বহু পরিশ্রমে চাষ করা শস্য ও শাকসবজি মাঠেই নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার শস্য বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(2) বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ যে শুধু প্রাণ হারায় তাই নয়, ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদ বন্যার জলে বিনষ্ট হয়।

(3) বন্যা জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিকে বিপর্যস্ত করে।

(4) পরিকাঠামো ও পরিসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। রাস্তা, রেল লাইন, নদীর ধারে ছোটো ছোটো বাঁধ ভেঙে যায়।

(5) পানীয় জলের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

(6) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগানে টান পড়ে।

(7) আন্ত্রিক, কলেরা প্রভৃতি রোগ ছড়ায়।

(8) বন্যা মানুষের মনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি (trauma) তৈরি করে।

(9) বন্যা মানুষের জীবিকা (livelihood) নষ্ট করে।

(10) সরকারি কোষাগারে অতিরিক্ত চাপ বাড়ায়। কারণ সাহায্য, এককালীন অনুদান, বাবদ বহু হাজার কোটি টাকা প্রতিবছর খরচ হয়।

● **সাম্প্রতিক কালে ভারতে কয়েকটি বড়ো বন্যার ঘটনা :**

সাল	রাজ্য / অঞ্চল	বিপর্যস্ত এলাকা	বন্যার কারণ
2005	মহারাষ্ট্র, গুজরাট	মুম্বাই শহর	পাঁচ দিনের টানা বৃষ্টি।
2008	বিহার	উত্তর বিহারের মাধেপুর, সহর্স, পূর্ণিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চল।	কোশী নদীর বাঁধে ভাঙন।
2010	লাদাখ	লে শহর ও সন্নিহিত এলাকা।	মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান।
2012, 2016, 2020	অসম	কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও সন্নিহিত এলাকা। অন্তত 30টি জেলা।	মুষলধারে টানা বৃষ্টি।
2013	উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, NCR (দিল্লি ও সন্নিহিত এলাকা)	2004 সালের সুনামির পরে এত বড়ো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর হয়নি।	জুন মাসে কয়েকদিন ধরে মেঘভাঙা বৃষ্টি। প্রায় 6000 জনের মৃত্যু।
2014	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর, POK	সেপ্টেম্বরে প্রচণ্ড বৃষ্টি।
2015	তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ	চেন্নাই ও আশপাশের এলাকা।	নভেম্বর মাসে একটি গভীর নিম্নচাপের জন্য প্রবল বৃষ্টি।
2018	কেরালা	সমগ্র রাজ্য, বিশেষত কোচি, কোজিকোড়, মালাপ্পুরম, কোট্টায়ম, কুট্টানাদ, কোল্লাম	আগস্টে প্রবল বৃষ্টি ও হড়পা বান।

সাল	রাজ্য / অঞ্চল	বিপর্যস্ত এলাকা	বন্যার কারণ
2019	অসম, বিহার, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা	বিভিন্ন নদী উপত্যকার বিস্তীর্ণ নীচু এলাকা।	জুনের শেষ ও জুলাই মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত।
2020	পশ্চিমবঙ্গ	বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা।	"আমফান" ঝড় (cyclone)। 24 ঘণ্টায় 400 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত।
2021	মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা	বিভিন্ন নদী উপত্যকার বিস্তীর্ণ নীচু এলাকা।	জুন-ডিসেম্বর মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। ওড়িশার যশ/ইয়াস (Yaas) ও জাওয়াদ (Jawad) সাইক্লোন-এর প্রভাব।

[উৎস : *IMD, Satellite bulletin এবং অন্যান্য*]

ভারতে কোথায় বন্যার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি?

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ ভারতের বন্যাপীড়িত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এসব জায়গায় প্রতিবছর বন্যা হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে আরও কয়েক কোটি টাকা সাহায্য বাবদ খরচ করতে হয়। সব মিলিয়ে বন্যা ভারতের সমাজ ও অর্থনীতিকে প্রতি বছর বিপর্যস্ত করে।

ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির অন্যতম হল —

(1) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু উদ্দেশ্যসাধক নদী পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়েছে (Multipurpose River Valley Project)। বৃষ্টির জল ধরার জন্য খাল, বিল, জলাশয় খনন করে তাদের গভীরতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

(2) ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট (Watershed management) বা জলবিভাজিকাগুলির সংরক্ষণের জন্য বনসৃজন, ভূমিক্ষয় নিবারণ প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(3) নদীর দুর্বল পাড় বরাবর বাঁধ নির্মাণ করা, পাঁচিল গেঁথে দেওয়া (retaining wall) ইত্যাদি কারিগরি পদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। সুন্দরবন ও উপকূল অঞ্চলে নদীবাঁধ ও ফ্লাড ওয়াল (Flood wall) এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাস নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরে উপকূল এলাকার বিভিন্ন স্থানে সি-ডাইক (Sea dyke) নির্মাণ করা হয়েছে।

(4) নদীর গভীরতা রক্ষার জন্য নদীর তলদেশ থেকে প্রয়োজন মতো মাটি কাটার বন্দোবস্ত করা হয়। একে "ড্রেজিং" (dredging) বলে।

(5) পাহাড়ি অঞ্চলে ধস ও বন্যা একে অপরের সঙ্গে জড়িত বলে ধস ও বন্যা নিবারণের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(6) বন্যাপীড়িত মানুষের আশ্রয়ের জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী শিবির গড়ে তোলা হয়। এই সব মানুষদের খাদ্য, পানীয় জল, জামাকাপড়, ত্রিপল, কম্বল ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে।

(7) বন্যার প্রকোপে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য বন্যাপ্রবণ এলাকায় জমির সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের চেষ্টা চলছে।

(8) দৈনন্দিন আবহাওয়ার ওপর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে নিয়মিত নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগের আগে জনগণকে আগাম সতর্ক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(9) নদীতে জলতলের উচ্চতার নিয়মিত তথ্য জেলাস্তরে রাখা হয় এবং জলতল বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণকে জানানো হয়।

(10) বন্যা সংক্রান্ত বিপর্যয়মূলক ঝুঁকি (risk) কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

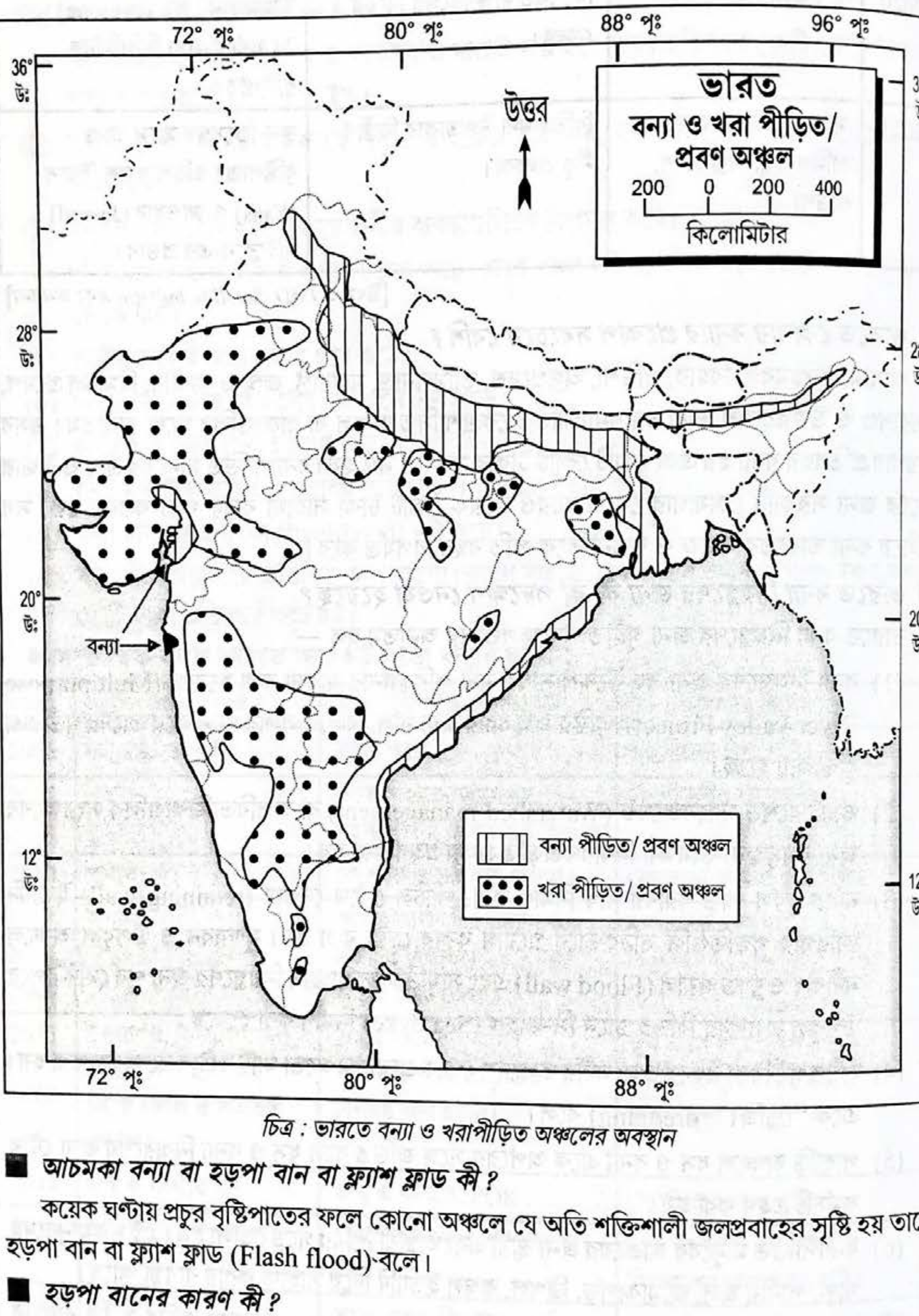

চিত্র : ভারতে বন্যা ও খরাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থান

■ ***আচমকা বন্যা বা হড়পা বান বা ফ্ল্যাশ ফ্লাড কী ?***

কয়েক ঘণ্টায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো অঞ্চলে যে অতি শক্তিশালী জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে হড়পা বান বা ফ্ল্যাশ ফ্লাড (Flash flood) বলে।

■ ***হড়পা বানের কারণ কী ?***

(1) স্বল্প স্থায়ী কিন্তু তীব্র ভারী বর্ষণ; (2) ঝড় ও বৃষ্টিপাত; (3) নদী পথে তুষারগলা জলের হঠাৎ তীব্র প্রবাহ; (4) ধসের ফলে নদীখাতে সৃষ্ট কোনো কৃত্রিম বাঁধের হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ইত্যাদি।

■ *মেঘভাঙা বৃষ্টি বা ক্লাউড বার্স্ট কী?*

মেঘভাঙা বৃষ্টি বা ক্লাউড বার্স্ট (cloud burst) হল অত্যন্ত তীব্র স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টিপাতের ঘটনা। সাধারণত বজ্রঝড় (thunderstorm)-এর সঙ্গে মেঘভাঙা বৃষ্টি (cloud burst)-এর ঘটনা ঘটে।

ভারতে সাম্প্রতিক ক্লাউড বার্স্ট :

(i) 2010 সালের 5 আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর ও লে অঞ্চলে এক ঘণ্টায় 250 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

(ii) 2016 সালের 1 জুলাই উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে 24 ঘণ্টায় 1372 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল।

(iii) 2021 সালের 12মে উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগ নামক স্থানে মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটে।

■ *ইদানীংকালে কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই প্রভৃতি উপকূলবর্তী শহরগুলি বর্ষাকালে দ্রুত জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কেন?*

ইদানীংকালে কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই প্রভৃতি শহরগুলি বর্ষাকালে দ্রুত জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কারণ এর পেছনে মানুষের অবিবেচনামূলক কাজের প্রভাব রয়েছে। যেমন—

(1) এই শহরগুলিতে খাল, খোলা নর্দমা ও ভূগর্ভস্থ নর্দমার মাধ্যমে বর্ষার জলনিকাশের (storm water drainage) যে ব্যবস্থা আছে, তা প্লাস্টিক ও পলি জমে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

(2) মুম্বাই-এর ক্ষেত্রে মিঠি নদী, চেন্নাইতে কউম (Cooum) নদী, কলকাতার ক্ষেত্রে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, মানিকতলা খাল, বাগজোলা খাল প্রভৃতির সংলগ্ন জমি জবরদখল করে ও আবর্জনা জমা করে নষ্ট করা হচ্ছে।

(3) নীচু জমিতে বাড়ি ও রাস্তা তৈরি করার ফলে জমির স্বাভাবিক ঢাল বদলে যাচ্ছে। ফলে বর্ষার জল তার ঢাল অনুযায়ী বয়ে যেতে পারছে না। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে।

(4) চেন্নাই সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে নর্দমা বা জলনিকাশি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এবং শহর সম্প্রসারণের সঙ্গে জলনিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ না হওয়ার জন্য বর্ষায় শহরে বন্যা হচ্ছে।

■ *শহরী বন্যা বা আরবান ফ্লাড (urban flood) কে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কী?*

(1) একবার ব্যবহারযোগ্য পাতলা প্লাস্টিকের ব্যাগ উৎপাদন করা ও ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা দরকার ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা প্রয়োজন;

(2) পুনর্নবীকরণযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগের দাম কাগজ, পাতা, খড়, পাট প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত করা ব্যাগের দামের চেয়ে বেশি রাখা;

(3) শহর এলাকায় জমির ঢাল অনুযায়ী জমির ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি ও মানচিত্র প্রস্তুত করা;

(4) নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত করা।

(5) আশপাশের জমির উচ্চতার সঙ্গে সমতা রেখে রাস্তার উচ্চতা বজায় রাখা।

8.7 খরা (Drought)

■ *খরা কাকে বলে?*

খরা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (India Meteorological Department সংক্ষেপে IMD)-এর মত অনুসারে কোনো অঞ্চলের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় 26 শতাংশ কম বৃষ্টি হলে বা বহুদিন ধরে বৃষ্টি না হলে যে অস্বাভাবিক শুষ্ক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বা ড্রাউট (drought) বলে।

■ *খরা কয় ধরনের?*

খরা পাঁচ ধরনের যথা (1) আবহাওয়াভিত্তিক খরা বা মিটিওরোলজিক্যাল ড্রাউট (Meterological drought), (2) কৃষিভিত্তিক খরা বা এগ্রিকালচারাল ড্রাউট (Agricultural drought), (3) জলের ঘাটতিজনিত খরা বা হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট (Hydrological drought), (4) শারীরবৃত্তীয় খরা বা ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট (Physiological drought), এবং (5) আর্থ-সামাজিক খরা বা সোসিও-ইকনমিক ড্রাউট (Socio-economic drought)।

■ *আবহাওয়াভিত্তিক খরা বা মিটিওরোলজিক্যাল ড্রাউট কী?*

কোনো স্থানের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় যথেষ্ট কম বৃষ্টিপাত হলে বা দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে,অথবা বহুদিন ধরে শুকনো অবস্থা চললে তাকে আবহাওয়াভিত্তিক খরা বা মিটিওরোলজিক্যাল ড্রাউট (Meteorological drought) বলে। India Meterological Dept. (IMD)-র মতে বৃষ্টিপাতের দীর্ঘকালীন (long term) গড়ের তুলনায় 26 শতাংশ বা তার বেশি বৃষ্টিপাত না হলে, সেই অবস্থাকে আবহাওয়াভিত্তিক খরা বলা হয়।

■ *আবহাওয়াভিত্তিক খরা কয় ধরনের ও কী কী?*

IMD-র মত অনুসারে আবহাওয়াভিত্তিক খরা (Meteorological drought) তিন ধরনের, যেমন — (i) **খরা** (drought) — স্বাভাবিকের তুলনায় অন্তত 26 শতাংশ কম বৃষ্টিপাত; (ii) **মধ্যমমানের খরা** (Medium drought) — স্বাভাবিকের তুলনায় 26-50 শতাংশ কম বৃষ্টিপাত; (iii) **প্রচণ্ড খরা** (Severe drought) — স্বাভাবিকের তুলনায় 50 শতাংশের বেশি বৃষ্টিপাত না হওয়া।

■ *কৃষিভিত্তিক খরা বা এগ্রিকালচারাল ড্রাউট কী?*

কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় জল যখন মাটিতে (soil water) কম থাকে, তখন মাটির ওই শস্যভিত্তিক শুষ্কতাকে কৃষিভিত্তিক খরা বা এগ্রিকালচারাল ড্রাউট (Agricultural drought) বলে। প্রসঙ্গত মাটিতে যে পরিমাণ জল স্বাভাবিকভাবে গড় অবস্থায় পাওয়া যায় তার 19 শতাংশ পর্যন্ত কম অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে ধরা হয়।

■ *জলের ঘাটতিজনিত খরা বা হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট কী?*

হ্রদ, পুকুর, জলাশয়, ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার (aquifer) প্রভৃতি এলাকাতে গড়ে যে পরিমাণ জল থাকার কথা তার চেয়ে কম জল থাকলে, সেই অবস্থাকে জলের ঘাটতিজনিত খরা বা হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট (Hydrological drought) বলে। এই ধরনের খরা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের (normal rain) অবস্থাতেও হতে পারে কারণ জলের খরচ বেশি হলে ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠের জলাশয়গুলিতে জলের জোগান কমে।

■ *শারীরবৃত্তীয় খরা বা বাস্তুতান্ত্রিক খরা বা ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট কী?*

মাটিতে ও জলে লবণের পরিমাণ উদ্ভিদের সহনশীল অবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে ওই জল ব্যবহার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে জলের অভাবে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটে না। এই বিশেষ ধরনের শুষ্কতার অবস্থা শারীরবৃত্তীয় খরা বা ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট (Physiological drought) নামে পরিচিত। একে বাস্তুতান্ত্রিক খরা-ও (Ecological drought) বলে।

■ *আর্থ-সামাজিক বা সোসিও-ইকনমিক ড্রাউট কী?*

যখন জলের জোগান কোনো অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় এবং তা পেশাগত ও সামাজিক কাজকর্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সেই শুষ্কতার অবস্থাকে আর্থ-সামাজিক খরা বা সোসিও-ইকনমিক ড্রাউট (Socio-economic drought) বলে।

■ *খরার কারণ কী?*

খরা প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি কারণে হতে পারে। যেমন—

- **প্রাকৃতিক কারণ :**

(1) কোনো প্রাকৃতিক কারণে আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়ে ওঠার ফলে খরা দেখা দেয়।

(2) গ্রিনহাউস প্রভাবের জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ফলে খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(3) বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হলে খরা হয়।

(4) কোনো স্থানে যে সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হওয়া দরকার, তার চেয়ে দেরিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হলে খরা হয়। যেমন — ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দেরিতে এলে এবং কম বৃষ্টিপাত ঘটলে দেশে খরা হয়। এছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশে বৃষ্টিপাতের বণ্টন (distribution) অসমান। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই অসমতা বাড়ছে।

- **মানুষের তৈরি কারণ :**

(1) অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কেটে ফেলার জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্পের জোগান কমে যায়। ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং খরার আশঙ্কা দেখা দেয়।

(2) ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি শহর, বাড়ি, অট্টালিকা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে, অর্থাৎ অতিরিক্ত নগরায়ণের (urbanization) ফলে স্থানীয়ভাবে উষ্ণতা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তাপ আবহাওয়াকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে এবং আঞ্চলিক খরা পরিস্থিতি দেখা দেয়।

■ *পরিবেশের ওপর খরার প্রভাব কী ?*

খরার প্রভাবে পরিবেশ ও জীবজগতের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হয়।

- **গাছপালার ওপর প্রভাব :** জলের অভাবে গাছপালা শুকিয়ে যায় এবং পাতা ঝরে যায়। ফলে সালোকসংশ্লেষ বিঘ্নিত হয়। অঙ্কুরোদ্‌গমের হার কমে যায়।
- **জীবজন্তুর ওপর প্রভাব :**

  (1) খরার প্রকোপে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং জলের অভাবে অসংখ্য জীবজন্তু মারা যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে ইথিওপিয়া, কেনিয়া, সুদান প্রভৃতি আফ্রিকার দেশগুলিতে খরার কবলে বহু প্রাণী প্রাণ হারিয়েছে।

  (2) খরার কবলে বিস্তীর্ণ এলাকার গাছপালা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় বলে তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে খাদ্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়। এই কারণে প্রচুর জীবজন্তু মারা যায়। দলেদলে জীবজন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জল ও খাবারের আশায় দেশান্তরী হয়। যেমন 2017-18 সালে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে তীব্র খরা চলেছে। ফলে জীবজন্তুর মৃত্যু হয়েছে।

- **মানুষের ওপর খরার প্রভাব :**

  (1) খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে যায়, ফলে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়।

  (2) ভৌম জলস্তর নেমে যায়। জলসেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

  (3) দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

  (4) পুষ্টিহীনতার কারণে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রাণ হারায়।

  (5) জলের অভাবে চাষবাস বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের দুঃখদুর্দশার অন্ত থাকে না। সাম্প্রতিক কালে ওড়িশার কালাহান্ডির খরা এইরকম এক বিপর্যয়ের উদাহরণ।

  (6) তাপ প্রবাহেও প্রচুর লোক মারা যায়।

- **পরিবেশের ওপর খরার প্রভাব :**

  (1) খাদ্যশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়।

  (2) পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

  (3) মরুভূমি মাপে বড়ো হতে থাকে। অর্থাৎ মরুভূমি সম্প্রসারিত হয়। একে ''মরুভূমিকরণ'' বা ইংরেজিতে ''ডেজার্টিফিকেশন'' (Desertification) বলে।

■ *খরা নিয়ন্ত্রণের উপায় কী?*

খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেগুলি হল—

(i) বর্ষার জল সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

(ii) শুষ্ক কৃষিব্যবস্থার (Dry farming) প্রবর্তন করা। প্রসঙ্গত, শুষ্ক কৃষি হল জলের প্রয়োজন কম এমন শস্যের চাষ করা।

(iii) মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধ করা ও বনসৃজনের মাধ্যমে ভৌমজল, মাটির জল, জলাশয়ের জলসম্ভারকে রক্ষা করা।

(iv) নিয়মিত বৃক্ষরোপণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

(v) খরাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ বিশেষ চাষে ড্রিপ জলসেচের (drip irrigation) ব্যবস্থা করা।

(vi) জলের অপচয় বন্ধ করা।

(vii) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খরা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করা।

(viii) জলের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে ও খরাপীড়িত অঞ্চলে মানুষের জন্য ত্রাণের বন্দোবস্ত করা।

(ix) সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র জলের অলবণীকরণ অর্থাৎ ডিস্যালিনেসন-এর (desalination) মাধ্যমে জলের জোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা।

(x) খরাপীড়িত অঞ্চলে ভৌমজল অতিরিক্ত তুলে নেওয়ার ওপর নিষেধ আরোপ করা।

■ *ভারতে খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলি কোথায় অবস্থিত?*

ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দেশের প্রায় 21 শতাংশ এলাকা খরাপ্রবণ। এর মধ্যে অন্তত 3 শতাংশ অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক (exceptionally dry)। রাজ্য অনুসারে, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, ওড়িশার পশ্চিমাংশ, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ইত্যাদি সাধারণত খরাপ্রবণ।

8.8 নদীপাড়ের ভাঙন (River Bank Erosion)

■ *নদীর স্বাভাবিক প্রকৃতি কী?*

সাধারণভাবে নদী হল ভূপৃষ্ঠের ওপরে একটি বহমান জলধারা। নদীর একটি উৎস (source) আছে। অন্য কোনো বড়ো নদী বা সাগর বা জলাশয়ে মিলিত হওয়ার জন্য নদীর একটি মিলনস্থল (confluence) বা মোহানা (mouth) আছে। আর আছে নদীর একটি স্থানপরিবর্তনশীল খাত (channel)। প্রকৃতির নিয়মে নদী পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নক্ষয় করে। ফলে নদীখাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়। বিপরীতভাবে, সমভূমির ওপরে নদী বেশি পার্শ্বক্ষয় করে। নদীর এই পাশাপাশি ক্ষয় করার প্রবণতা, নদীকে আরও প্রশস্ত বা চওড়া করে তোলে। এটি নদীর একটি অতি সাধারণ প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ঘটনা হলেও, মানুষের কাছে এটি এক বিশেষ ধরনের দুর্যোগ।

■ *নদীপাড়ের ভাঙনকে দুর্যোগ বলে মনে করা হয় কেন?*

নদীপাড়ের ভাঙন একটি দীর্ঘস্থায়ী (long term), ধীর আঘাতকারী (slow striking), সাধারণ (common) দুর্যোগ। এটি প্রাকৃতিক (natural hazard) দুর্যোগ। আবার কিছু ক্ষেত্রে মনুষ্য-সৃষ্ট (man-made) দুর্যোগ, কারণ স্থানীয়ভাবে নদীপাড়ের বালি, নুড়ি কেটে সরিয়ে নিলে নদীপাড়ের ভাঙন বাড়ে।

নদীপাড়ের ভাঙন একটি দুর্যোগ। কারণ—

(1) নদীর দুপাশে সাধারণত নানা মাপের ও নানা ধরনের চাষের জমি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, বাড়িঘর থাকে। নদীর পাড় ভাঙলে চাষের জমি, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ইত্যাদির বিপুল ক্ষতি হয়।

(2) নদীখাতের দু'পাশের মাটি পলিগঠিত এবং উর্বর। এই মাটিতে রয়েছে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির বিপুল জোগান। নদীপাড়ের মাটি আর্দ্র বা ভিজে ধরনের। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি। তাই নদীর দুপাশের বিস্তৃত প্লাবনভূমি (Floodplain) কৃষিকাজের উপযুক্ত। নদীর পাড়ে ভাঙন হলে তাই চাষের জমি নষ্ট হয়। চাষিরও সর্বনাশ হয়।

(3) নদীর ভাঙনের ফলে নদীর ধারে গড়ে ওঠা গ্রাম, নগর, শহর প্রভৃতি বসতিগুলি দারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য গ্রাম এইভাবে ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেছে। এই কারণেই বহু নদীর নাম হয়েছে 'কীর্তিনাশা'।

(4) নদী পাড়ের ভাঙন বন্যার আশঙ্কা বাড়ায়। ফলে শস্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

(5) মোহনার কাছে নদীর ভাঙনের ফলে চাষের জমিতে জোয়ারের লোনা জল ঢুকে পড়ে। ফলে জমি লবণাক্ত হয় এবং কৃষির ক্ষতি হয়।

(6) জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে নদীর দুপাশে চাষের জমি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি গ্রাম-শহরের আয়তনও আগের চেয়ে বেড়েছে। ফলে নদীর ভাঙনের জন্য আগে মানুষের যতটা ক্ষতি হত, এখন তার চেয়ে ক্ষতি হয় বহুগুণে বেশি।

■ *প্রাকৃতিক কারণে নদীর পাড় ভাঙে কেন?*

নদীর পাড় ভাঙনের প্রাকৃতিক কারণ হল—

(1) নদীর আঁকাবাঁকা খাতের ভেতর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ার সময়ে অবতল বাঁকে নদীস্রোত সরাসরি আঘাত করে, ফলে অবতল বাঁকে ভাঙন ধরে এবং উত্তল বাঁকে চর সৃষ্টি হয়।

(2) নদীখাতের ভেতরে ঘূর্ণি স্রোত (বা হেলিক্যাল ফ্লো)-এর প্রভাবে নদীর অবতল বাঁকের তলদেশে ক্ষয় হয়। ফলে নদীর পাড় ভেঙে পড়ে।

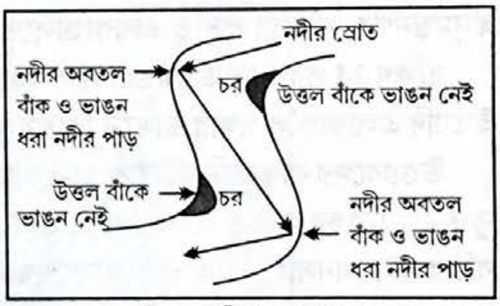

চিত্র : নদীবাঁকে ভাঙন

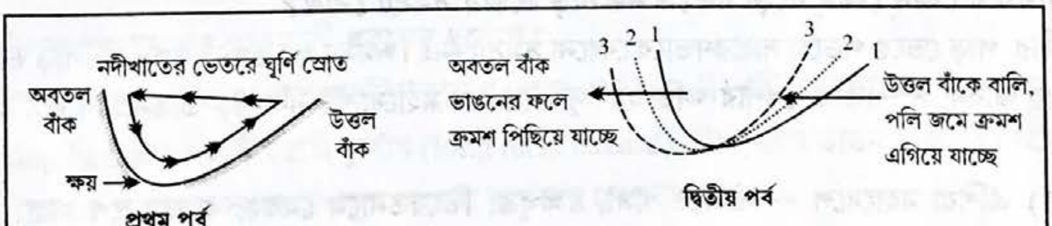

চিত্র : নদীখাতের প্রস্থচ্ছেদে ভাঙনের প্রক্রিয়া

(3) নদীর অবতল বাঁকের নীচে ছোটো ছোটো ঘূর্ণির জন্য টো-ক্ষয় হয় (Toe erosion)। ফলে পাড়ের নীচে তৈরি হওয়া গর্তের ওপরে নদীর পাড় বেশিক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে না। তাই ভেঙে পড়ে। এইভাবে নদীর পাড় ভাঙে।

চিত্র : নদীখাতের তলদেশে টো-ক্ষয় ও নদীপাড়ে ভাঙন

নদীপাড় ভাঙার জন্য মানুষ কীভাবে দায়ী?

(1) নদীখাতে অবৈধ বালি খাদান থেকে অপরিকল্পিত ভাবে বালি কেটে তোলা হলে, নদীর স্রোতের প্রকৃতি স্থানীয় ভাবে বদলে যায়, ফলে নদীপাড়ের ভাঙন বাড়ে।

(2) নদীখাতের ভেতর থেকে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর এবং অন্যান্য প্রকল্পের নির্মাণের জন্য নুড়ি, বজরি, পেবল, গ্র্যাভেল প্রচুর পরিমাণে তুলে নিলে নদীখাতে জলের প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে নদীর পাড় ভাঙে।

(3) নদীপাড়ে কংক্রিটের খুঁটি নির্মাণ করে তার ওপর বাড়ি তৈরি করা হলে, অনেক ক্ষেত্রে নদী পার্শ্বক্ষয়ের মাধ্যমে ওই খুঁটিগুলি ভেঙে ফেলে।

(4) নদীপাড়ের গাছপালা, যা নদীপাড়ের মাটিকে স্থায়িত্ব দেয়, তা কেটে সাফ করা হলে নদীর পাড় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে নদীর ভাঙনের সমস্যা কোথায় বেশি?

পশ্চিমবঙ্গের সব নদীতেই ভাঙনের সমস্যা আছে। তবে মুরশিদাবাদের পদ্মা ও ভৈরব নদী, দক্ষিণ 24 পরগনার হুগলি, মালদহের গঙ্গা, উত্তরবঙ্গের কালজানি, তোর্সা, গদাধর, মানসাই, ধরলা, সিঙিমারি প্রভৃতি নদীর ভাঙন ভয়াবহ।

মালদহের মানিকচক, ভূতনীর চর, কালিয়াচক প্রভৃতি অঞ্চলে গঙ্গার ভাঙন অত্যন্ত তীব্র। মুরশিদাবাদে পদ্মার ভাঙনে জেলার ভগবানগোলা-2 নং ব্লকের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। শুধু আখেরিগঞ্জেই ইতিমধ্যে বহুকোটি টাকার জমি ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। পদ্মার ভাঙনের ভয়ংকর প্রভাব পড়েছে আখেরিগঞ্জ, খড়িবোনা, হনুমন্তনগর, নসিপুর প্রভৃতি এলাকাগুলিতে।

দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার হরিনারায়ণপুর, হাঁড়া, মুকুন্দপুর, নুরপুর, নৈনান, দুর্গাপুর ইত্যাদি এলাকাগুলি গঙ্গার ভাঙনে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কালজানি নদীর ভাঙনে আমবাড়ি, চিলাখানা, বেলাকোপা; কালজানি ও রায়ডাকের ভাঙনে তুফানগঞ্জের চর বালাভূত, ঘেনাপাড়া, গুয়ারভাটা; তোর্সা নদীর ভাঙনে খোকসাডাঙা; সংকোশের ভাঙনে বক্সিরহাট; মানসাই নদীর ভাঙনে ফুলেশ্বরী, চান্দামারি, বৈরাতি; সিঙিমারির ভাঙনে দিনহাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ বড়ো নদীতে নদীপাড় ভাঙার সমস্যা বেশি?

নদীর পাড় ভেঙে পড়লে সাধারণভাবে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয় তখনই যখন নদীপাড় ভাঙলে মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও পেশার ক্ষতি হয়। পৃথিবীর সব মহাদেশেই নদীপাড় ভাঙনপ্রবণ নদী আছে, যেমন—

(1) এশিয়া মহাদেশে — ভারতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র; ভিয়েতনামে মেকং; বাংলাদেশে পদ্মা; চিনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াং হো ইত্যাদি;

(2) আফ্রিকা মহাদেশে — নীলনদ, কঙ্গো, জাইরে, অরেঞ্জ;

(3) ইউরোপ মহাদেশে — টেম্স, দানিয়ুব;

(4) উত্তর আমেরিকা মহাদেশে — মিসিসিপি মিসৌরি এবং

(5) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে — আমাজন ইত্যাদি।

নদীর ভাঙন রোধ করার উপায় কী?

নদীর ভাঙন রোধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় থাকলেও প্রতিটি উপায়ই সব জায়গার জন্য সমানভাবে কার্যকর নয়। নদীতে জলের পরিমাণ, জলের গতিবেগ, স্রোতের চরিত্র, নদীপাড়ের মাটির বৈশিষ্ট্য, নদীর দু'ধারের জমি ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর ভাঙন প্রতিরোধের বন্দোবস্ত নির্ভর করে। তবে সাধারণত নদীর ভাঙন রোধ করার জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়, তা হল—

(1) ভাঙনপ্রবণ পাড় বরাবর বাঁশ ও শালের খোঁটা পর পর পুঁতে কৃত্রিম দেওয়াল তৈরি করে দেওয়া।

(2) নদীর স্রোতের ধরন অনুসারে বোল্ডারের পাঁচিল, কংক্রিটের পাঁচিল বা ইট-পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করা।

(3) নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ করা যাতে গাছের শিকড় আলগা মাটি ধরে রাখতে পারে।

(4) নদীর পাড় বরাবর প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের মাদুর বিছিয়ে দেওয়া। কারিগরি বিজ্ঞানের ভাষায় একে "জিও-সিন্থেটিক্স" বা "জিও-টেক্সটাইলস" (Geo-synthetics or Geo-textiles) বলে।

(5) আপৎকালীন অবস্থায় ভাঙনপ্রবণ পাড় বরাবর বালির বস্তা পর পর সাজিয়ে ভাঙনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করা ইত্যাদি।

8.9 উপকূলের ভাঙন বা সমুদ্রতটের ভাঙন (Coastal Erosion)

সমুদ্র ও স্থলভাগের সংযোগস্থলকে উপকূল বা কোস্ট (Coast) বলে। উপকূলের সামনের অংশকে তটভূমি বা শোর (Shore) বলা হয়। এই তটভূমির ওপর প্রতিদিন অসংখ্য, অগণিত ঢেউ আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের ভরা কটালের (High tide) নিম্নসীমা থেকে উপকূলের খাড়াই পাড়ের নিম্নসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হল তটভূমি। তটভূমির ওপর নুড়ি, বালি প্রভৃতি সঞ্চয়ের ফলে সৈকত বা বিচ(Beach) তৈরি হয়। যেমন— দিঘার সৈকত, পুরীর সৈকত ইত্যাদি।

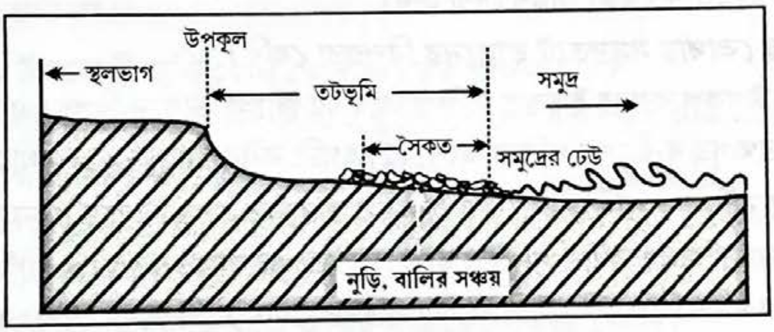

চিত্র : উপকূল অঞ্চলে ভূমিরূপের বৈচিত্র্য

■ *উপকূল অঞ্চলের ভাঙন কী ধরনের দুর্যোগ?*

উপকূল অঞ্চলের ভাঙন হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ (natural hazard)। এটি ধীর আঘাতকারী দুর্যোগ (slow striking hazard) এবং দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ (long term hazard)। উপকূলের ভাঙন সারা বছর ধরে চলে। তবে জোয়ার ও ঝড়ের সময়ে উপকূল অঞ্চলে ভাঙনের প্রবণতা বাড়ে।

■ *উপকূলের ভাঙনকে দুর্যোগ বলে মনে করা হয় কেন?*

উপকূলের ভাঙনকে দুর্যোগ বলে মনে করা হয়, কারণ : (1) সমুদ্র সৈকতের ভাঙনের ফলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়, (2) চাষের জমি নষ্ট হয়, (3) পর্যটন শিল্প মার খায়, (4) মাছ ধরার কাজ ব্যাহত হয়, (5) বন্দরের কাজ বিঘ্নিত হয়, (6) সমুদ্রের লোনা জল আশপাশের জমিকে লবণাক্ত করে তোলে, (7) বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে মানুষকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

উপকূলের ভাঙন শুধু যে মানুষেরই ক্ষতি করে তাই নয়, উপকূলের বাস্তুতন্ত্রেরও ক্ষতি করে। কারণ ভাঙনের ফলে বহু শত হেক্টর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বনভূমি নষ্ট হওয়ার ফলে পোকামাকড়, পশু পাখির আবাস নষ্ট হয়। উপকূলের অগভীর সমুদ্রে মাছের খাবারে টান পড়ে। খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হয়। উপকূলের বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। উপকূলের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়।

■ *উপকূল বা সমুদ্রতটে ভাঙন দেখা দেয় কেন?*

উপকূল বা সমুদ্রতটে অনেক সময়ে ভাঙন দেখা দেয়, কারণ :

(1) সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে বাহিত শিলাচূর্ণ সমুদ্রতটের ওপরে ক্রমাগত ঘর্ষণ করে বলে উপকূলে ভাঙন দেখা দেয়।

(2) উপকূল অঞ্চলে শিলার সঙ্গে সমুদ্রজলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে শিলা দুর্বল হয়। ফলে ভাঙন দেখা দেয়।

(3) "সোয়াশ" (Swash) বা আগুয়ান সমুদ্রস্রোত ও "ব্যাকওয়াশ" (Backwash) অর্থাৎ পশ্চাদমুখী সমুদ্রস্রোতের জন্য সমুদ্রতটে ভাঙন হয়।

(4) উপকূলমুখী ঢেউ সমুদ্রতটের ওপর হাতুড়ির মতো আঘাত করে এবং সমুদ্রতটে ভাঙন ধরায়।

(5) উপকূলের ফাটল ধরা শিলার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লে, ফাটলের মধ্যে অবরুদ্ধ বায়ু সংকুচিত হয় এবং প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। এভাবেও উপকূলের ভাঙন শুরু হয়।

(6) অনেক সময়ে উপকূলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সমুদ্রতরঙ্গ এক জায়গায় স্থির হয়ে ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে থাকে, এই ধরনের ঢেউকে বলে "ক্ল্যাপোটিস" (Clapotis)। ফলে পাড়ের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়। এ কারণেও ভাঙন হয়।

(7) উপকূল উন্মুক্ত হলে, জলের গভীরতা কম হলে, শিলার দৃঢ়তা বা ক্ষয় প্রতিরোধী ক্ষমতা কম হলে উপকূলে ক্ষয় হয়। ভাঙন দেখা দেয়।

■ *পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সমুদ্রতটে ভাঙনের বিপন্নতা বেশি?*

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল বরাবর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বহু জায়গা ভাঙনে বিপন্ন। এদের মধ্যে অন্যতম হল— (1) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের পশ্চিম অংশ; (2) হুগলি নদীর মোহনা; (3) দিঘার সমুদ্র উপকূল।

■ *গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের পশ্চিম অংশে উপকূলীয় ভাঙনের সমস্যা আছে কেন?*

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত বদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এর আয়তন 150×10^6 বর্গ কিলোমিটার। এখানে প্রতি বছরে নদীবাহিত পলি, বালি, মাটির পরিমাণ 200 কোটি টনের বেশি। এই বদ্বীপের মধ্যে হরিণঘাটা নদীর মোহনার পশ্চিমে বিরাট এলাকা জুড়ে বিগত 200 বছর ধরে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পদ্মা নদী দিয়ে ইদানীং জল ও পলি বেশি আসছে। অন্যদিকে হুগলি নদী দিয়ে বদ্বীপে পলির জোগান কমে গেছে। তাই হুগলি নদীর মোহনায় সঞ্চয়ের চেয়ে সমুদ্রের ক্ষয় বেড়েছে। ফলে ভাঙনের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

■ *হুগলি নদীর মোহানায় ভাঙনের সমস্যা কেন?*

হুগলি নদীর মোহানায় জোয়ার-ভাটার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্র থেকে জোয়ারের সময়ে যে বিপুল পরিমাণ জল হুগলি নদীর মোহানা দিয়ে ঢুকে পড়ে তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা এই নদীর নেই। হুগলির নদী খাতের গভীরতা কম, ফলে হুগলির মোহানায় দীর্ঘকাল ধরে ভাঙনের সমস্যা চলছে। এছাড়া নদীর দু-পাশে লম্বা বাঁধ (embankment) বেঁধে দেওয়ার জন্য জোয়ারের জল নদীর কূল ছাপিয়ে ভেতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে নদী মোহানায় ভাঙন হয়।

■ *দিঘার সমুদ্রতটে ভাঙনের সমস্যা কেন?*

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে দিঘা হল পূর্ব ভারতের অন্যতম সমুদ্র শহর। এখানে বিগত 50 বছর ধরে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং স্থানীয় মানুষের রুজিরোজগার বাড়িয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দিঘার সমুদ্র উপকূলে ভাঙনের সমস্যা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে দিঘার উপকূল বরাবর ভাঙনের সমস্যা পশ্চিম দিকে নতুন দিঘার তুলনায় পূর্ব দিকে পুরাতন দিঘা অঞ্চলে অনেক বেশি। ভাঙন রোধ করার জন্য এখানে ল্যাটেরাইট

ও গ্র্যানিট পাথর দিয়ে প্রায় 3 মিটার উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে সমুদ্রতট পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নীচু হতে শুরু করেছে।

8.10 নদীখাত ও বেলাভূমি থেকে বালি তোলার সমস্যা (Sand Mining from River Bed and Coast)

নদীখাত, নদী সংলগ্ন জায়গা ও বেলাভূমি অঞ্চলে বালি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি বহু লক্ষ কোটি বছরের প্রচেষ্টায় এই বালির আস্তরণ তৈরি করেছে। বালির এই আস্তরণকে বাঁচিয়ে রাখা খুব জরুরি। কারণ বালি আছে বলেই বালিতে জল ধরে রাখার সুযোগ আছে। নদীখাত ও উপকূলের বেলাভূমি থেকে মানুষ যত বালি তুলে নেবে, নদীখাত, বেলাভূমি ও তার নীচের মাটির স্তর তত শুকিয়ে যাবে। জলশূন্য হবে। জলের জন্য হাহাকার বাড়বে।

■ ***ইদানীং নদীখাত ও বেলাভূমি থেকে বালি তোলার প্রবণতা বেড়েছে কেন?***

নানা ধরনের নির্মাণের জন্য, ইট তৈরি করার জন্য, কংক্রিট বা ঢালাই-এ মেশানোর জন্য, এমনকি কাচ (glass) উৎপাদন করার জন্য বালির প্রয়োজন হয়। নদীখাত ও বেলাভূমি থেকে নির্মাণ কাজের উপযুক্ত অমসৃণ দানা বালি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই ওই বালি সংগ্রহ করা হয়।

■ ***মরুভূমিতে এত বালি থাকলেও সেই বালি সংগ্রহ করা হচ্ছে না কেন?***

মরুভূমির বালি হল খুব মিহি বালি ও মসৃণ (smooth) বালি। তাই মরুভূমির বালি কখনই নির্মাণ কাজের উপযোগী নয়।

■ ***নির্মাণ কাজের উপযোগী বালি কোন্ কোন্ জায়গায় পাওয়া যায়?***

নির্মাণ কাজের উপযোগী অমসৃণ বালি নদীখাত, হ্রদের তলদেশ ও উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়।

■ ***নির্মাণের উপযোগী বালি কী রপ্তানি করা হয়?***

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নির্মাণের উপযোগী বালি কেনিয়া, মরক্কো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ক্যারাবিয়ান সাগর সংলগ্ন এলাকা), অস্ট্রেলিয়া থেকে রপ্তানি করা হয়।

■ ***ভারতে নদী ও বেলাভূমি থেকে বালি ও নুড়ি সংগ্রহের সমস্যা কেমন?***

ভারতে নদী ও বেলাভূমি থেকে বালি ও নুড়ি সংগ্রহের সমস্যা নগরায়ণের সঙ্গে তাল রেখে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী; বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া জেলার নদীগুলি থেকে বালি সংগ্রহ করা চলছে।

কেরালার পম্পা, মনিমালা ও আচানকোভিল নদী বালি তোলার কারণে শুকিয়ে গেছে। মণিপুর ও ত্রিপুরাতে এই সমস্যা প্রকট হয়েছে।

■ ***নদীখাত ও বেলাভূমি থেকে বালি সংগ্রহ করলে কী সমস্যা হয়? পরিবেশে তার ক্ষতিকর প্রভাব কী?***

(1) নদী, বেলাভূমি, হ্রদ ইত্যাদি হল জাতীয় সম্পদ। এইসব জায়গা থেকে বিনা অনুমতিতে বালি, নুড়ি তোলা হল বেআইনি কাজ। অপরাধমূলক কাজ।

(2) অতিরিক্ত বালি তোলার ফলে নদী ও উপকূল অঞ্চলের মাটি শুকিয়ে যায়। চাষের ক্ষতি হয়।

(3) বালি জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। বালি তুলে ফেলা হলে মাটিতে জল কমে। ভৌমজল ভাণ্ডার কমে যায়।

(4) খরা ও বন্যার প্রবণতা বাড়ে। বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক বাসভূমি নষ্ট হয়। জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবুও সারা পৃথিবী জুড়ে এই ক্ষতিকর কাজ চলছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় 40 (চল্লিশ) বিলিয়ন টন বালি তোলা হচ্ছে, যার বাজার মূল্য প্রায় 70 বিলিয়ন ডলার। ভারতে বেআইনি বালির বাজারের আর্থিক পরিমাপ হল আনুমানিক বছরে 1000 কোটি টাকা।

8.11 এল নিনো ও দক্ষিণ দোলন বা সাদার্ন অসিলেসন অর্থাৎ ENSO (El Nino and Southern Oscillation — ENSO)

■ *এল নিনো কাকে বলে?*

এল নিনো (El Nino) হল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রান্তীয় অঞ্চলে চিলির উপকূলে 2 থেকে 7 বছর অন্তর দেখা দেওয়া, অস্থির ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির দক্ষিণমুখী উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। এল নিনো পেরুর উপকূলে প্রবাহিত শীতল পেরু স্রোত বা হামবোল্ট স্রোত (Peru current or Humboldt Current)-কে হটিয়ে দিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এল নিনো নামক এই সমুদ্রস্রোত কখন শুরু হবে বা কখন থেমে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তবে ডিসেম্বরের শেষে বড়োদিনের কাছাকাছি সময়ে এল নিনো দেখা দেয়। এই সমুদ্রস্রোতের অস্থির প্রকৃতির কথা স্মরণ করে একে বিজ্ঞানীরা দুরন্ত বালকের সঙ্গে তুলনা করেন। ('নিনো' শব্দের অর্থ দুরন্ত বালক।) প্রসঙ্গত, বিগত 50 বছরে 10টি এল-নিনোর ঘটনা ঘটেছে।

■ *এল নিনোর পরিবেশগত প্রভাব কী?*

এল নিনোর ফলে পরিবেশ নানা ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন—

(1) ভারতীয় উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ুর আসা-যাওয়া অনিয়মিত করে। যার ফলে ভারত ও সংলগ্ন দেশগুলিতে অতিবৃষ্টি ও খরার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

(2) পেরুর উপকূল অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে সমুদ্রস্রোতের তাপমাত্রা এল-নিনোর প্রভাবে 10° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(3) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এল-নিনোর প্রভাবে বায়ুর চাপ এবং বায়ুর গতিবেগ বদলে যায়। ফলে এই অঞ্চলে ঝড়ের সংখ্যা ও ঝড়ের তীব্রতার বদল ঘটে।

(4) উষ্ণ এল-নিনোর প্রভাবে প্রবাল অর্থাৎ কোরাল (coral)-এর ক্ষতি হয়।

(5) পেরু ও ইকুয়েডরের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়। মাছের খাদ্য প্ল্যাঙ্কটনের জোগান কমে। ফলে সামুদ্রিক মাছ কম ধরা পড়ে। তা ছাড়া ওই এলাকায় সমুদ্র তীরের বনভূমির ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

■ *ENSO কী?*

এল নিনোর প্রভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের বিশাল এলাকা জুড়ে বিশেষত 180° দ্রাঘিমা ও 120° পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে বায়ুমণ্ডলে ও সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় বলে বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাকে "এল নিনো সাদার্ন অসিলেসশন" (El Nino Southern Oscillation) বা সংক্ষেপে ENSO নামে চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় একে এল নিনো দক্ষিণ দোলন বা দক্ষিণী ওঠাপড়া বলা যায়।

■ *লা নিনা কী?*

লা নিনা (La Nina) হল ENSO-র শীতল পর্যায় (cold phase) অর্থাৎ শীতল স্রোত। প্রসঙ্গত এল নিনো হল ENSO-র উষ্ণ পর্যায় (warm phase)।

স্প্যানিশ শব্দ 'লা-নিনা'-র অর্থ হল ছোটো মেয়ে। লা নিনাকে অনেক ক্ষেত্রে anti-El Niino অর্থাৎ এল নিনোর বিপরীত অবস্থা বলা হয়।

■ *লা নিনার পরিবেশগত প্রভাব কী?*

লা নিনার পরিবেশগত প্রভাব হল —

(1) শীতল লা নিনার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্য ও পূর্ব অংশে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 3°–5° সে. হ্রাস পায়।

(2) লা নিনার স্থায়িত্ব প্রায় 5-6 মাস।

(3) সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে বায়ুচাপের পার্থক্য ঘটে। ফলে আটলান্টিক মহাসাগরে ও উত্তর আমেরিকায় হারিকেন ঝড়ের উৎপত্তি, বিস্তার ও তীব্রতা বাড়ে।

(4) দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, ইকুয়েডর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে খরার সৃষ্টি হয়।

8.12 আধা-প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিপর্যয় (Quasi-Natural and Man made Disaster)

◆ 8.12.1 ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (Bhopal Gas Tragedy)

ভারতের কলকারখানার ইতিহাসে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো এত বড়ো বিপর্যয় এর আগে কখনও ঘটেনি। কোনো কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী একে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনা আখ্যা দিয়েছেন।

■ ***ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কবে, কোথায় ও কীভাবে ঘটেছিল?***

1984 সালের 2-3 ডিসেম্বর মধ্যরাতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির কীটনাশক পদার্থ তৈরি করার কারখানায় ''মিক'' গ্যাস ভরতি দু-তিনটি ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ ঘটে।

'মিক' গ্যাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম হল ''মিথাইল আইসোসায়ানেট'' বা সংক্ষেপে মিক [MIC]। এই গ্যাস থেকে কার্বরিল বা সেভিন নামক কীটনাশক উৎপাদন করা হয়।

2 ডিসেম্বরের শেষ ও 3 ডিসেম্বরের শুরুতে গভীর রাতে 0° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে রাখা মিক গ্যাস ভরতি ট্যাঙ্কের রেফ্রিজারেটর যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। মিক গ্যাসের ধর্ম হল যে, এই গ্যাসকে ঠান্ডা, শীতল করে না রাখলে নিজের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই গ্যাস উদ্বায়ী, দাহ্য এবং বিষাক্ত।

সুতরাং রেফ্রিজারেটর যন্ত্র বিকল হওয়ার ফলে এবং অন্যান্য গোলযোগের জন্য মিক ভরতি ট্যাঙ্কের মধ্যে অল্প জল ঢুকে যায়। এখন মিক গ্যাসকে সুস্থির করার জন্য যে 'ফসজিন' নামক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, সেই ফসজিনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে প্রায় 20 টন মিক গ্যাস ও কার্বন ডাইঅক্সাইড, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

■ ***ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত?***

ভূপালের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে চারপাশে প্রায় চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে মিক ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মাঝরাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে আশেপাশের ঘুমন্ত লোকজন তীব্র বিষাক্ত গ্যাসে মারা পড়ে। এই দুর্ঘটনায় —

(1) সরকারি হিসেবে প্রায় 2,900 জন লোক মারা যায়। বেসরকারি হিসেবে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার।

(2) বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে শিশু ও বয়স্ক মানুষেরা সবচেয়ে বেশি চোখ জ্বালা ও শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকে অন্ধ হয়ে যায় এবং অনেকে ফুসফুস ও মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হয়।

(3) প্রসূতি মায়েদের মধ্যে জননতন্ত্রের রোগ বৃদ্ধি পায়।

(4) কম বেশি প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ গ্যাস দুর্ঘটনার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার দশ বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ মারা যায় ও অসংখ্য লোক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে।

(5) দুর্ঘটনার পরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি, বেসরকারি ও বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা উদ্ধার, সেবা ও চিকিৎসা সহায়তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্যাস দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি অস্বীকার করতে পারে না বলে, ভারত সরকার

ও মধ্যপ্রদেশ সরকার এই মার্কিন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে। পরে বহুদিন মামলা চলার পর 1994 সালে এই কোম্পানি ভারত সরকারের হাতে মাত্র 47 কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ তুলে দেয়।

■ *ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পরিবেশগত গুরুত্ব কী?*

ভূপালের আগে পৃথিবীর কোথাও কীটনাশক রাসায়নিক কারখানা থেকে এত ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই দুর্ঘটনার ফলে মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও পরিবেশের দারুণ ক্ষতি হয়েছে।

● **মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি :** ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। প্রতিবন্ধী হয়ে জীবনযাপন করছে কয়েক লক্ষ লোক। ক্যানসার, ফুসফুসের রোগ, মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হয়েছে আরও অসংখ্য লোক। সুতরাং এই দুর্ঘটনা একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে দৈহিকভাবে অক্ষম ও অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করেছে।

দুর্ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র বিচার করলে দেখা যায় যে,

প্রথমত, ভূপালের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** 2–3 ডিসেম্বর অর্থাৎ শীতের মাঝরাতে এই গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে অধিকাংশ লোক এই সময়ে ঘুমিয়েছিল। তারা নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগটুকু পায়নি।

তৃতীয়ত, আলোচ্য বহুজাতিক মার্কিন সংস্থায় সতর্কীকরণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

● **পরিবেশের দূষণ :** পরিবেশগত ভাবে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার আর একটি দুর্ভাগ্যজনক দিক হল যে, শীতকালে বিকাল থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত বাতাস ঠান্ডা ও ভারী থাকে বলে ধোঁয়া, গ্যাস ইত্যাদি সহজে বায়ুতে মিশে যেতে পারে না। তাই শীতের সন্ধেবেলা শহর ও শহরতলি অঞ্চলে ধোঁয়াশার ভাসমান স্তর দেখা যায়। ঠিক এই কারণেই মাঝরাতের বিস্ফোরণে নিষ্ক্রান্ত বিষাক্ত মিক (MIC) ও অন্যান্য গ্যাস আকাশে মিলিয়ে যেতে পারেনি। ওই গ্যাস ঘনীভূত হয়ে নীচে নেমে এসেছিল। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত ব্যাপক হয়েছে। বায়ু দূষিত হয়েছে।

■ *ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছে?*

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য এই শিক্ষা পেয়েছি যে,

(1) চাষবাসের ক্ষেত্রে কীটনাশক দরকার হলেও কীটনাশক পদার্থ উৎপাদনের জন্য শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কারখানা নিষিদ্ধ করা দরকার।

(2) উৎপাদিত দ্রব্য মানুষের কাছে কতটা বিপজ্জনক সেই অনুসারে জমি বণ্টনের সঠিক নিয়মকানুন থাকলে ও তার উপযুক্ত প্রয়োগ করা হলে ভূপাল দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি এমন ভয়ংকর হত না। সুতরাং জমির ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মনীতি (land use principles) আশু প্রবর্তন করা দরকার।

(3) যে-কোনো ধরনের কলকারখানায় নিরাপত্তা ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ও জোরদার করা প্রয়োজন।

(4) দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইনকানুনের প্রয়োগ আরও কঠোর করা দরকার।

(5) জনসাধারণকে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন করা দরকার।

■ *ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় হতাহতরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কী?*

1989 সালে আদালতের নির্দেশে ইউনিয়ন কার্বাইড 47 কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেয়। 2004 সালে সেই জমা টাকা সুদে-আসলে বেড়ে দাঁড়ায় 1503 কোটি টাকা। 19 জুলাই 2004 তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ওই পুরো টাকা হতাহতের পরিবারবর্গকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

◆ 8.12.2 চের্নোবিল বিপর্যয় (Chernobyl Disaster)

■ *চের্নোবিল কোথায়? চের্নোবিলের দুর্ঘটনা কবে ঘটেছিল?*

চের্নোবিল ইউক্রেনের একটি শহর। ইউক্রেন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল, এখন স্বাধীন দেশ। 1986 সালের 26 এপ্রিল চের্নোবিলের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে।

■ *চের্নোবিল দুর্ঘটনা কী কারণে ঘটেছিল?*

1986 সালের 26 এপ্রিল ইউক্রেনের চের্নোবিল শহরে স্থাপিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক ত্রুটি ও কর্মীদের অসাবধানতার ফলে যে বিস্ফোরণ ও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে, আধুনিক মানুষের ইতিহাসে তা চের্নোবিল দুর্ঘটনা (Chernobyl Disaster) নামে স্মরণীয় হয়ে আছে।

চের্নোবিল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম মৌল ব্যবহার করা হত। এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার দিন ওই বন্দোবস্তগুলি চালু ছিল না। ফলে পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে ইউরেনিয়াম জ্বালানি প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে প্রায় 3000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

■ *চের্নোবিল দুর্ঘটনার পরিবেশগত প্রভাব কী?*

চের্নোবিল দুর্ঘটনায় মানুষ ও প্রকৃতির দারুণ বিপর্যয় ঘটে। সমগ্র পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর এই দুর্ঘটনার প্রভাব পড়েছে।

● **মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব :**

(1) **ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড :** পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে আগুন ধরে যায়। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় দশ দিন সময় লাগে। বহু মানুষ আগুনে ঝলসে মারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, পরমাণু বোমা ফাটলে ঠিক এভাবেই ব্যাপক এলাকা জুড়ে মুহূর্তে আগুন লাগে।

(2) **জীবন ও স্বাস্থ্যহানি :** বিস্ফোরণের ফলে নির্গত আয়োডিন-131, সিজিয়াম-137 প্রভৃতি আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে শুধুমাত্র চের্নোবিলের আশেপাশে 31 জন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 209 জন কর্মী গুরুতর অসুস্থ হন ও প্রায় 10 কোটি মানুষকে পুনর্বাসন দিতে হয়।

(3) **রুজি-রোজগারের ওপর প্রভাব :** চের্নোবিল দুর্ঘটনার জন্য বহু চাষিকে তার জমি থেকে, শ্রমিককে তার কলকারখানা থেকে সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়। ফলে সরকারি সাহায্য পেলেও এই দুর্ঘটনা তাদের অর্থনৈতিক ভাবেও পঙ্গু করেছে।

● **প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাব :**

(1) **বায়ুদূষণ :** দুর্ঘটনার ফলে নির্গত আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, দাহ্য গ্যাস, ধোঁয়া ও উত্তপ্ত বাষ্প বায়ুমণ্ডল দূষিত করেছে।

(2) **জল ও মাটি দূষণ :** তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলির কিছুটা বৃষ্টির জলের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার ফলে জল ও মাটি দূষিত হয়েছে।

(3) **উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে দূষণ :** তেজস্ক্রিয় পদার্থে জল ও মাটি বিষাক্ত হওয়ার ফলে, তা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয়েছে। কারণ গোরুর দুধের মধ্যে আয়োডিন-131 মৌল খুঁজে পাওয়া গেছে।

(4) **পরিবেশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ :** চের্নোবিল দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য "রাষ্ট্রসংঘের সায়েন্টিফিক কমিটি অন্ এফেক্টস্ অব অ্যাটমিক রেডিয়েশন" (UN Scientific Committee on Effects of Atomic Radiation) ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, 1986 সালে বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রিসে তেজস্ক্রিয়

বিকিরণের পরিমাণ ছিল 0·6–0·8 মিলিসিয়েভার্ট ও সুইজারল্যান্ড এবং রোমানিয়াতে 2·00 মিলিসিয়েভার্ট। বস্তুত বিকিরণের এই মাত্রা যে অত্যন্ত বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের নিরাপদ মাত্রা হল বছরে 3·65 মিলিসিয়েভার্ট (millisieverts) অর্থাৎ প্রতিদিন 0·01 মিলিসিয়েভার্ট।

■ *চের্নোবিল দুর্ঘটনা থেকে মানুষ কী শিক্ষা পেয়েছে?*

চের্নোবিলের দুর্ঘটনা মানুষকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছে। সেগুলি হল—

● **পারমাণবিক শক্তি পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা বন্ধুভাবাপন্ন নয় :** পারমাণবিক শক্তি থেকে সস্তায় প্রচুর বিদ্যুৎ পাওয়া গেলেও, এই শক্তি কোনোভাবেই পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা বন্ধুভাবাপন্ন নয়। যান্ত্রিক গোলযোগ বা মানুষের কর্তব্যে অবহেলা, যে কারণেই হোক না কেন, পারমাণবিক চুল্লিতে যদি বিস্ফোরণ ঘটে তা হলে সেই দেশের ও প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হবে। তাদের শরীর, স্বাস্থ্য, বনসম্পদের ক্ষতি হবে।

● **পারমাণবিক চুল্লি থেকে ভবিষ্যতে আরও দুর্ঘটনার আশঙ্কা :** চের্নোবিলের দুর্ঘটনার প্রভাব যদিও এক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কোনো জায়গায় হয়তো এত অল্প সময়ে দুর্ঘটনার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বাড়বে।

● **নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা :** পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের সময়ে পরিবেশ আইন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণবিধি আরও কঠোরভাবে মানতে হবে। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বা তার ধারেকাছে এই শক্তিকেন্দ্রগুলি কিছুতেই স্থাপন করা চলবে না।

● **উন্নয়নশীল দেশগুলির বিপদ :** মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চের্নোবিলের চেয়ে বড়ো মাপের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র ভারত সহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ভবিষ্যতে হয়তো স্থাপন করার দরকার হবে। সে ক্ষেত্রে যদি ওই দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর না হয়, তা হলে বিদেশ থেকে কেনা পুরোনো প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা শক্তিকেন্দ্রগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ হবে। কারণ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকারি প্রযুক্তিবিদ্যা তাদের নেই বলে, সব সময়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। বিদেশি রাষ্ট্রের আরোপ করা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম বিদেশি কোম্পানি ঠিক করে দেবে এবং জনগণ শোষণের শিকার হবে।

◆ 8.12.3 ফুকুসিমা দুর্ঘটনা (Fukushima Accident)

■ *ফুকুসিমা কোথায়? ফুকুসিমা দুর্ঘটনা কবে ঘটেছিল?*

জাপানের হনসু দ্বীপের তোহোকু অঞ্চলে ফুকুসিমা অবস্থিত। এখানে একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। 11 মার্চ 2011, ফুকুসিমা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভূমিকম্প, সুনামি ও যান্ত্রিক দুর্ঘটনার কারণে বিধ্বস্ত হয়।

■ *পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র কাকে বলে?*

যে আধুনিক কারখানায় ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয় মৌল ব্যবহার করে বিভাজন (fission) বা সংযোজন (fusion) পদ্ধতিতেউৎপন্ন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তাকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বলে। 1956 সালে ব্রিটেনের ক্যালডার হলে বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

■ *ফুকুসিমা দুর্ঘটনা কেন ঘটেছিল?*

11 মার্চ 2011-তে জাপানে তীব্র ভূমিকম্প ঘটে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 9·0। এর ফলে 15 মিটার উঁচু সুনামির সৃষ্টি হয়।

পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলিতে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এমন যান্ত্রিক বন্দোবস্ত থাকে যে ভূমিকম্পের ঢেউ আঘাত করলেই পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রগুলি নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। সেই মতো ওই দিনে দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেলেও "ফুকুসিমা ডাইচি" (Fukushima Daiichi) 1, 2, 3 ইউনিটগুলি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়নি। বস্তুত ফুকুসিমা কেন্দ্রের পরমাণু উৎপাদক ব্যবস্থা ভূমিকম্প প্রতিহত করতে সমর্থ হলেও সুনামি প্রতিরোধক ছিল না। সুনামির পরবর্তী পঞ্চম দিনে ফুকুসিমা কেন্দ্রের 4 (চার) নম্বর ইউনিটগুলিও বিকল হয়ে যায়।

■ *পরিবেশের ওপর ফুকুসিমা দুর্ঘটনার প্রভাব কী?*

(1) **মাটি দূষণ :** দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় Cs-137 আইসোটোপ বেরিয়ে আসে। এর হাফ-লাইফ (half-life) হল 30·1 বছর। ফলে আগামী বহু বছর মাটি দূষিত থাকবে।

(2) **জলদূষণ, বাস্তুতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ক্ষতি :** তেজস্ক্রিয় Cs-137 আইসোটোপ প্রশান্ত মহাসাগরের জলেও মিশেছে। কারণ সমুদ্রের জল ঢেলে ফুকুসিমা কেন্দ্রের দুর্ঘটনা কবলিত ইউনিটগুলি ঠান্ডা করা হয়েছিল। ফলে প্ল্যাঙ্কটন ও মাছের ক্ষতি হবে। জাপানের পূর্ব উপকূলে মাছ ধরার কাজ ইতিমধ্যে যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে।

(3) **জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি :** দুর্ঘটনার কারণে ও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সরাসরি কোনো মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও বিজ্ঞানীদের মতে আগামী দিনে 100 থেকে 1000 জন মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হবে।

(4) **পরিবেশগত রিফিউজি :** ফুকুসিমার আশপাশের প্রায় 80 কিমি. দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। এই বাস্তুচ্যুত মানুষেরা হলেন পরিবেশগত উদ্বাস্তু বা এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি (Environmental Refugee)।

(5) **খাদ্যে নিয়ন্ত্রণ :** ফুকুসিমা ও সংলগ্ন মিয়াগি (Miyagi) অঞ্চলে প্রস্তুত করা শূকরের মাংস, বাঁশের শিকড়, ব্রিম (Bream), ফ্লাউন্ডার (Flounder) প্রভৃতি প্রজাতির মাছ ধরা ও তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

■ *পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা কী?*

সস্তায় প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আজকাল বহু দেশেই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কারণ মাত্র 100 গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে প্রায় 27 লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। অন্যদিকে এর সমপরিমাণ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদন করতে হলে প্রায় 1350 মেট্রিক টন কয়লা লাগে। কয়লা বা খনিজ তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এমনিতে কোনো অসুবিধে নেই, তবে মুস্কিল হল যে, সারা পৃথিবী জুড়ে কয়লা ও খনিজ তেলের ভাণ্ডার ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে।

এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন। তবে পারমাণবিক শক্তি থেকে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায় না। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে পারমাণবিক চুল্লি বসানো হয়েছে।

■ *পারমাণবিক শক্তি কী পরিবেশের পক্ষে নিরাপদ?*

ফুকুসিমা (2011) ও চের্নোবিলের ঘটনা (1986) আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে যে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপদ আছে। এই ধরনের দুর্ঘটনায় আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বায়ুমণ্ডলকে বহু বছরের জন্য বিষাক্ত করে তোলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে জল, মাটি, বাস্তুতন্ত্র দূষিত হয়। মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। তবে শুধু দুর্ঘটনার ভয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করা অনুচিত কাজ। এতে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। দরকার হল উন্নত প্রযুক্তি ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

4.13 বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

■ *বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কী?*

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (Disaster Management) বলতে কোনো বিপর্যয় ঘটার আগে ও পরে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার রূপায়ণকে বোঝায়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সমগ্র পরিকল্পনাটি একটি প্রবাহচিত্রে দেখানো হল—

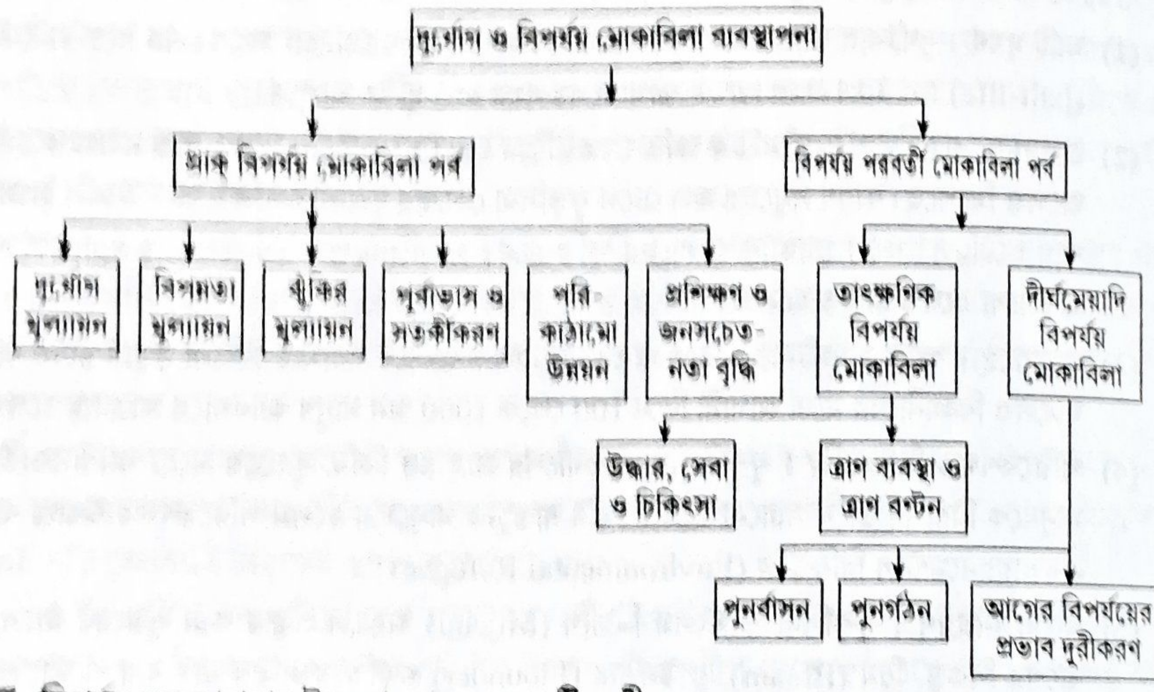

■ *বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভ কী?*

রাষ্ট্র বা প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলার চেষ্টা করে, কারণ উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভ (objectives) হল—

(i) মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া, (ii) জনসাধারণের মধ্যে বিপর্যয় সম্পর্কে প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলা, (iii) মানুষের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সামর্থ্য ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা, (iv) বিপদগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়া, (v) উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা, (vi) বিপর্যয় থেকে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা ও ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি।

■ *বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মূল নীতি বা প্রিন্সিপল কী?*

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজ যে নীতি (principles) বা আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি হল—

(i) বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ (control) করা, (ii) মানুষকে নিরাপত্তা (safety) দেওয়া, (iii) বিপর্যয় মোকাবিলায় সমদর্শিতা (equality) অর্থাৎ পক্ষপাত না করা (impartiality), (iv) বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সুরক্ষা (safety) গড়ে তোলার চেষ্টা করা, (v) বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা (planning) গ্রহণ করা।

■ *বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বা ইমপরট্যান্স (importance) কী?*

বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই কাজের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সঠিকভাবে ওই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা, প্রয়োজনীয় মানবসম্পদকে ব্যবহার করা বিশেষ জরুরি। দুর্যোগ ও বিপর্যয় ঘটার আগে সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা যেমন দরকার, তেমনি বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা, পরিসেবা দেওয়া, পরিকাঠামো নির্মাণ করা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

■ ***বিপর্যয় মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের দায়িত্ব কীরূপ?***

প্রশাসন ও সরকার বিভিন্ন স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা বা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করে যেমন —

(1) কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণ করে ও ত্রাণ পাঠায়।

(2) রাজ্য সরকার ওই নীতি রূপায়ণ করে। এই কাজে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর অংশগ্রহণ করে।

(3) পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, ব্লক, জেলাস্তরে ত্রাণবণ্টন, উদ্ধার, চিকিৎসা, আশ্রয়দান, খাদ্যের জোগান, জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হয়।

■ ***বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র কী?***

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ কাজটিকে একটি চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র বা ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট সাইক্‌ল (Disaster Management Cycle) বলা হয়। আলোচ্য চক্রের দুটি প্রধান অংশ রয়েছে, যথা — (1) বিপর্যয়ের পূর্ববর্তী পর্ব এবং (2) বিপর্যয় পরবর্তী পর্ব।

চিত্র : বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

■ ***প্রাক্-বিপর্যয় মোকাবিলা পর্ব কী?***

কোনো বিপর্যয় ঘটার আগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রবণতা অনুযায়ী সম্ভাবনাময় বিপর্যয় সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহ করা, বিপর্যয় মোকাবিলার কৌশল স্থির করা ও সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ সংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগকে একত্রে **প্রাক্-বিপর্যয় মোকাবিলা পর্ব** ইংরেজিতে প্রি-ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট ফেজ (Pre-disaster Management Phase) বলে।

■ ***প্রাক্-বিপর্যয় মোকাবিলা পর্বে কী ধরনের কাজ করা হয়?***

এই পর্বে ছয়টি ধাপে কাজ করা হয়, যেমন—

(1) সম্ভাব্য বিপর্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা (Data collection)। এটি প্রথম ধাপের কাজ। যেমন— (a) অতীতে ওই একই বিপর্যয় ঘটে থাকলে সেই বিপর্যয়ের স্থান সমীক্ষা করা, (b) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন ও ভৌগোলিক বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করা, (c) ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা, (d) ওই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যে যে পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা। এই সমস্ত কাজকে একত্রে **দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মূল্যায়ন** (Hazard and Disaster Evaluation) বলা হয়।

(2) বিপদগ্রস্ততা বা বিপন্নতার মূল্যায়ন (Vulnerability Evaluation) হল প্রাক্-বিপর্যয় মোকাবিলা পর্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আলোচ্য ধাপে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কতটা অঞ্চল জুড়ে কত মানুষ ও জীব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কী পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংস হতে পারে, সে সম্পর্কে আগাম হিসাবনিকাশ করা হয়। সম্ভাব্য বিপন্ন এলাকার মানচিত্র আঁকা হয় এবং বিপন্নতার মাত্রা অনুযায়ী বিপন্নতা হ্রাস করার পদক্ষেপ ও পদ্ধতি স্থির করা হয়।

(3) ঝুঁকির মূল্যায়ন (Risk Evaluation)। এটি তৃতীয় ধাপ। আলোচ্য ধাপে মূল্যায়নের বিষয় হল যে, সব রকমের প্রস্তুতি সত্ত্বেও কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি আসন্ন বিপর্যয় থেকে স্বীকার করে নিতে হবে, সে সম্পর্কে আগাম ধারণা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(4) প্রাক্-বিপর্যয় মোকাবিলা পর্বের চতুর্থ ধাপ হল **পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ** (Forecast and Warning)। এই পর্বে আসন্ন বিপর্যয় সংক্রান্ত পূর্বাভাস দেওয়া হয়। যেমন, নদীতে জল বৃদ্ধির পূর্বাভাস, ঝড়ের পূর্বাভাস ইত্যাদি। এই কাজে সবরকমের গণমাধ্যম, যেমন — টিভি, রেডিয়ো, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে কাজে লাগানো হয়। ফলে জনগণ ও প্রশাসন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পান। মানুষজন নিকটবর্তী আশ্রয় শিবিরে সরে যেতে পারেন।

(5) **পরিকাঠামোগত উন্নয়ন** (Infrastructural Development)। এটি পঞ্চম ধাপের কাজ যথা, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ত্রিপল জাতীয় আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা, শুকনো খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি।

(6) **প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা** (Training and Peoples' Awareness)। এটি ষষ্ঠ ধাপের উদ্যোগ। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সাধারণ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করবে, সে সম্পর্কে আগাম প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রস্তুতি নেওয়া ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

■ ***বিপর্যয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনা পর্বের প্রধান উদ্যোগ বা কাজগুলি কী?***

কোনো বিপর্যয় ঘটলে ত্রাণ ও উদ্ধার প্রভৃতি স্বল্পমেয়াদি কাজ এবং পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজকে একসঙ্গে বিপর্যয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনা পর্ব বলে। আলোচ্য পর্বের দুটি অংশ আছে।

প্রথম অংশটি হল বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে **উদ্ধার কাজ, ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজ**। এই কাজ কতদিন ধরে চলবে, তা বিপর্যয়ের তীব্রতা অনুযায়ী স্থির করা হয়। সাধারণত সাত থেকে তিরিশ দিন পর্যন্ত এই কাজ চলে। তবে বিপর্যয় পরবর্তী প্রথম এক সপ্তাহ এই কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে রোগ সংক্রমণ ও মহামারির ঘটনা ঘটে।

ব্যবস্থাপনা পর্বের **দ্বিতীয় অংশটি হল পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও বিপর্যয়ের প্রভাব দূরীকরণ পর্ব**। এই পর্যায়ের প্রথম স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, ঘরবাড়ি নির্মাণের উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা এবং গবাদিপশু ক্রয় ও কৃষি বা ব্যাবসার খরচের জন্য ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়। আলোচ্য পর্বের দ্বিতীয় স্তরে পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হয়, নতুন পরিকাঠামো (যেমন — আশ্রয় শিবির স্থাপন, নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি) কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া অতীত বিপর্যয়ের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে জনজীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা হয়।

■ ***ফোর টিয়ার রেসপন্‌স মেকানিজম কী?***

ফোর টিয়ার রেসপন্‌স মেকানিজম (Four tier response mechanism) বলতে ভারতে বিপর্যয় মোকাবিলার চার-স্তরীয় ব্যবস্থাকে বোঝায়, যথা—

(1) **প্রথম স্তর বা জাতীয় স্তর-এ** (National Level) ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্‌স ফোর্স (National Disaster Response Force অর্থাৎ NDRF)-এর মাধ্যমে যে-কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা হয়।

(2) **দ্বিতীয় স্তর বা রাজ্য স্তর-এ** (State Level) স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্‌স ফোর্স (State Disaster Response Force অর্থাৎ SDRF)-এর মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা করা হয়।

(3) **তৃতীয় স্তর বা জেলা স্তর-এ** (District Level) ডিসট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (District Disaster Management Authority অর্থাৎ DDMA)-এর মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলা করা হয়।

(4) **চতুর্থ স্তর বা ব্লক স্তর-এ** (Block Level) স্থানীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন যৌথ ভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করে। প্রয়োজনে SDRF-কে জানায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও সাহায্য নেওয়া হয়।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 2005 কী?

ভারতে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে 2005 সালে যে আইন প্রণয়ন করা হয়, তা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (Disaster Management Act, 2005) নামে পরিচিত। এই আইনের বলে দেশে বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গড়ে তোলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যেমন — (i) জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF), (ii) রাজ্যস্তরে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (SDRF), (iii) জেলাস্তরে ডিসট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (DDMA) ইত্যাদি।

NDRF কী?

NDRF-এর পুরো নাম হল ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (National Disaster Response Force - NDRF)। 2005 সালে প্রণীত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট-এর বলে 2006 সালে NDRF গঠন করা হয়। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (Ministry of Home Affairs) অধীন। এর সদর দপ্তর নয়াদিল্লির অন্ত্যোদয় ভবন (Antyodaya Bhawan)। NDRF ভারতে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা করার সর্বোচ্চ সংস্থা ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (National Disaster Management Authority — NDMA)-এর নির্দেশে কাজ করে। BSF, CISF, SSB, ITBP প্রভৃতি আধা-সামরিক বাহিনী থেকে দক্ষ সদস্যদের নিয়ে NDRF গঠন করা হয়েছে। NDRF-এর 12 ব্যাটেলিয়ান সদস্যকে দেশের 12টি শহরের 12টি কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছে। আলোচ্য 12টি কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা, গুয়াহাটি, পুনে, পাটনা, ইটানগর, বারাণসী ইত্যাদি। NDRF জল-স্থল ও অন্তরীক্ষে যে-কোনো দুর্যোগের মোকাবিলা করতে পারে।

SDRF কী?

SDRF-এর পুরো কথাটি হল স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (State Disaster Response Force - SDRF)। 2005 সালে গৃহীত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট-এর বলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য স্থানীয় রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত SDRF গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে SDRF -এর সদর দপ্তর নবান্ন, HRBC বিল্ডিং, হাওড়া-তে অবস্থিত।

কুইক রেসপন্স টিম বা QRT কী?

দুর্যোগ বা বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করার জন্য প্রশিক্ষিত মানুষদের নিয়ে প্রশাসন যে দল গঠন করে তাকে কুইক রেসপন্স টিম (Quick Response Team) বা QRT বলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার অন্তর্গত মহকুমা (sub-division) শহরে QRT মোতায়েন করা হয়েছে।

দুর্যোগের ক্ষেত্রে সাড়া বা রেসপন্স (response) বলতে কী বোঝায়?

রেসপন্স (response) বলতে বোঝায় সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া। যে-কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষ সেবা, সাহায্য, উদ্ধার কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে সাড়া দেয়। এই সাড়া বা response যত সুপরিকল্পিত হবে, ততই সাড়া বা দুর্যোগের প্রত্যুত্তর উপযুক্ত হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও টেকনলজিকে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন—

(1) যোগাযোগ ও তথ্য আদানপ্রদানের জন্য টেলিফোন, মোবাইল ফোন, Ham radio, Whats App, Facebook, Twitter প্রভৃতি মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হয়।

(2) বিভিন্ন দুর্যোগের উৎপত্তি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থান ও ক্ষমতার পরিবর্তন প্রভৃতি বোঝার জন্য উপগ্রহ ও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যথা—

   (a) খরা বা drought জরিপের জন্য METEOSAT ও NOAA কৃত্রিম উপগ্রহ ভালো;

   (b) বন্যা পরিস্থিতি জানার জন্য SPOT, NOAA, IRS কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ভরযোগ্য;

   (c) ঘূর্ণিঝড়-এর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রাডারসহ IMS, NOAA, METEOSAT উপগ্রহ ভালো।

বিশেষ আলোচনা

8.1 করোনা / কোভিড-19 অতিমারি (Corona / Covid-19 Pandemic)

■ ***করোনা / কোভিড-19 অতিমারি কী ধরনের দুর্যোগ?***

করোনা / কোভিড-19 একটি আধা-প্রাকৃতিক (Quasi-natural) মানুষের তৈরি দুর্যোগ।

■ ***অতিমারি বা প্যানডেমিক কী?***

অতিমারি বা প্যানডেমিক (pandemic) বলতে সেই ধরনের মহামারিকে (epidemic) বোঝায়, যে রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কখনই সীমাবদ্ধ থাকে না এবং এই সংক্রমণ বিশাল এলাকা জুড়ে পৃথিবীর নানা দেশে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। যেমন — AIDS, কোভিড-19।

■ ***মহামারি বা এপিডেমিক কী?***

অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মানুষের মধ্যে কোনো রোগ একই কারণের ভিত্তিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে, ওই রোগটিকে মহামারি বা এপিডেমিক (epidemic) বলা হয়। যেমন, ভারতে 1918 সালে ঘটেছিল ফ্লু (Flu), 1974 সালে বসন্ত বা স্মল পক্স (small pox) ইত্যাদি।

• সাধারণত অন্তত টানা দু'সপ্তাহ ধরে কোনো রোগে কোনো অঞ্চলের অন্তত এক লক্ষ মানুষের মধ্যে 15 জনের বেশি লোক আক্রান্ত হলে, ওই রোগটি মহামারি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

■ ***মহামারি বা এপিডেমিক এবং অতিমারি বা প্যানডেমিক-এর মধ্যে তফাত কী?***

কোনো রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার কতটা ব্যাপক বা বিশাল এলাকা জুড়ে ঘটেছে, তা বোঝাতে মহামারি (ইংরেজিতে "এপিডেমিক" [epidemic]) এবং অতিমারি (ইংরেজিতে "প্যানডেমিক" [pandemic]) শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়।

কোনো রোগ মহামারিতে (epidemic) পরিণত হলে ওই রোগের সংক্রমণ বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও, তা কোনো মহদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন— 1916 সালে USA-র পোলিয়ো রোগ।

কিন্তু কোনো রোগের সংক্রমণ যখন অতিমারিতে (pandemic) পরিণত হয়, তখন প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে তার বিস্তার ঘটে। যেমন— কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ, H1N1 সোয়াইন ফ্লু-র সংক্রমণ, AIDS-এর সংক্রমণ ইত্যাদি।

■ ***করোনা ভাইরাস কী?***

করোনা ভাইরাস (Coronavirus) হল একটি ভাইরাস পরিবার যার কিছু সদস্যের (strain) সংক্রমণে মানুষের হাঁচি, কাশি, প্রবল শ্বাসকষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মারা যায়।

■ ***করোনা ভাইরাস, নভেল করোনা ভাইরাস ও কোভিড-19 কী এক?***

করোনা ভাইরাস হল একটি ভাইরাস পরিবার। এই পরিবারের কিছু সদস্য মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে।

করোনা ভাইরাসের যে সদস্যকে (strain) 2019 সালে চিনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে মানব দেহে প্রথম শনাক্ত করা সম্ভব হয়, তাকে নভেল করোনা ভাইরাস (Novel Coronavirus) বলে। প্রসঙ্গত, ইংরেজি "নভেল" (novel) কথাটির অর্থ নতুন।

করোনা ভাইরাস থেকে 2019 সালে উদ্ভূত রোগকে ইংরেজিতে "করোনা ভাইরাস ডিজিজ" (coronavirus disease) বা "কোভিড-19" (COVID-19) বলে। COVID-19 এর "CO" মানে

করোনা (corona), "VI" মানে ভাইরাস (virus), "D" মানে ডিজিজ অর্থাৎ রোগ (disease) এবং "19" হল 2019 সাল।

ইনটারন্যাশনাল কমিটি অন ট্যাক্সোনমি অব ভাইরাসেস (ICTV) করোনা ভাইরাসের যে সদস্যটি বর্তমানে অতিমারি সৃষ্টি করেছে, তার নাম দিয়েছেন "SARS-CoV-2" (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)।

আগে অর্থাৎ 2019 ও 2020 সালের প্রথম দিকে COVID-19 কে "2019 নভেল করোনা ভাইরাস" বা "2019-nCoV" নামে ডাকা হত।

■ ***করোনা ভাইরাস নামের সঙ্গে যুক্ত "করোনা" শব্দটির মানে কী?***

"করোনা" (corona) শব্দটির অর্থ মুকুট (crown)। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ-এর) নীচে করোনা ভাইরাসকে দেখলে তার দেহের বাইরে প্রোটিনের কাঁটা বা স্পাইকগুলিকে "মুকুট" অর্থাৎ "করোনা" (corona)-র মতো দেখায় বলে, আলোচ্য ভাইরাসটির নামে "করোনা" শব্দটি যোগ হয়েছে।

■ ***করোনা বা কোভিড-19 রোগের সংক্রমণ প্রথম কোথায় লক্ষ করা হয়?***

চিনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে 2019 সালের ডিসেম্বরে প্রথম করোনা বা কোভিড-19 রোগের সন্ধান পাওয়া যায়।

■ ***করোনা ভাইরাস কী পশু, পাখি, প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের দেহে ছড়ায়?***

করোনা ভাইরাস পশু, পাখি, প্রাণীর মাধ্যমে (zoonotic) মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। যেমন —

(i) সিভেট প্রজাতির বিড়াল (Civet Cat)-এর মাধ্যমে সার্স-কোভ (SARS-CoV) ভাইরাস ছড়ায়। সিভেট বিড়াল আফ্রিকা ও এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়।

(ii) ড্রমাডেরি প্রজাতির উট (Dromedary Camel) অর্থাৎ এক-কুঁজওয়ালা আরবি উটের মাধ্যমে মার্স-কোভ (MERS-CoV) ভাইরাস ছড়ায়।

(iii) সর্বপ্রথম চিনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে বাদুড়ের মাধ্যমে সার্স-কোভ-টু (SARS-CoV 2) অর্থাৎ নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হয় এবং তারপরে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে হাঁচি-কাশি-সর্দির মাধ্যমে।

■ ***করোনা বা কোভিড-19 রোগের উপসর্গ কী?***

করোনা বা কোভিড-19 রোগ হলে সর্দিকাশি, জ্বর, গলা ব্যথা এবং প্রবল শ্বাসকষ্ট হয়।

■ ***করোনা বা কোভিড-19 রোগ প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?***

(i) অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন হলে দুটি মাস্ক একসঙ্গে লাগাতে হবে, যাতে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সর্দিকাশির ছোঁয়া নিজের নাক-মুখে না লাগে।

(ii) সাবান দিয়ে বারেবারে ভালো করে হাত ধুতে হবে। প্রয়োজন মতো স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত ও অন্যান্য দরকারি জিনিসকে জীবাণু মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(iii) বাইরে ব্যবহার করা জামাকাপড় প্রতিদিন সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করতে হবে। সাবানে জামাকাপড় করোনা ভাইরাস-মুক্ত হয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

(iv) সামাজিক দূরত্ব বিধি যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে।

(v) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করোনা-টিকা নিতে হবে।

■ ***করোনা বা কোভিড-19 আক্রান্ত দেশের সংখ্যা কত?***

WHO বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 2019-এর ডিসেম্বর থেকে 2022-এর জানুয়ারি মাস, এই 26 মাস সময়ের মধ্যে কম-বেশি পৃথিবীর সব দেশেই করোনা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে

করোনা রোগীর সংখ্যা অনুযায়ী সর্বপ্রথম হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (প্রায় 7·5 কোটি), দ্বিতীয় স্থানে ভারত (প্রায় 4·1 কোটি), এবং তৃতীয় স্থানে ব্রাজিল (প্রায় 2·5 কোটি)।

■ *বিশ্বে করোনা বা কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর মোট সংখ্যা কত?*

WHO বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত বিশ্বে 223টি দেশ ও অঞ্চলে মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় 37 কোটি।

■ *বিশ্বে করোনা বা কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার কত?*

WHO-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী করোনা রোগীদের পৃথিবীব্যাপী গড় মৃত্যুহার হল প্রায় 2·1 শতাংশ।

■ *কোন্ ধরনের লোকজনের মধ্যে করোনার সংক্রমণ বেশি?*

বৃদ্ধ এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ বেশি বলে চিকিৎসক মহল মনে করেন। গড়ে 30-80 বছর বয়সি পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ বেশি হয়েছে। এঁরা বিশ্বের করোনা আক্রান্ত মোট রোগীর প্রায় 87 শতাংশ। 18 বছরের কম বয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে করোনা রোগের প্রকোপ কম, গড়ে মোট রোগীর 8 শতাংশ।

■ *ভারতে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কত? এঁদের মধ্যে মৃত্যুহার কত?*

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ভারতে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় 4·1 কোটি।

এঁদের মধ্যে মৃত্যুহার 1·44 শতাংশ। প্রসঙ্গত, করোনায় বিশ্বে মৃত্যুহার হল 2·1 শতাংশ।

■ *পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কত? এঁদের মধ্যে মৃত্যুহার কত?*

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় 19·9 লক্ষ।

এঁদের মধ্যে মৃত্যুহার 1·78 শতাংশ।

■ *করোনা আক্রান্ত সর্বাধিক মানুষের সংখ্যা অনুসারে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য কী কী?*

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ভারতে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম পাঁচটি রাজ্য হল —

(i) মহারাষ্ট্র (প্রায় 76·8 লক্ষ আক্রান্ত) : ভারতে সবচেয়ে বেশি
(ii) কেরল (প্রায় 59·3 লক্ষ আক্রান্ত)
(iii) কর্ণাটক (প্রায় 37·6 লক্ষ আক্রান্ত)
(iv) তামিলনাড়ু (প্রায় 33·1 লক্ষ আক্রান্ত)
(v) অন্ধ্রপ্রদেশ (প্রায় 22·6 লক্ষ আক্রান্ত)

[তথ্যসূত্র : *mygov.in/corona-data/covid-19-statewise-status*]

■ *সবচেয়ে কম করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার বিচারে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কী কী?*

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে সবচেয়ে কম করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল—

(i) মিজোরাম (প্রায় 1·7 লক্ষ জন আক্রান্ত)
(ii) সিকিম (প্রায় 37·9 হাজার জন আক্রান্ত)
(iii) দাদরা ও নগরহাভেলি (প্রায় 11·3 হাজার জন আক্রান্ত)
(iv) লাক্ষাদ্বীপ (প্রায় 11 হাজার জন আক্রান্ত)
(v) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (প্রায় 9·7 হাজার জন আক্রান্ত)

[তথ্যসূত্র : *mygov.in/corona-data/covid-19-statewise-status*]

■ ***করোনা রোগীর সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান কোথায়?***

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সপ্তম।

পশ্চিমবঙ্গের আগে রয়েছে অষ্টম স্থানে উত্তরপ্রদেশ (20·0 লক্ষ আক্রান্ত)।

[তথ্যসূত্র : *mygov.in/corona-data/covid-19-statewise-status*]

■ ***করোনায় সর্বাধিক মৃত্যুর সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য কী কী?***

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে করোনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য হল —

(i) মহারাষ্ট্র (করোনায় মৃত 1·4 লক্ষ) : ভারতে সর্বাধিক
(ii) কর্ণাটক (করোনায় মৃত 38·9 হাজার)
(iii) তামিলনাড়ু (করোনায় মৃত 37·5 হাজার)
(iv) দিল্লি (করোনায় মৃত 25·8 হাজার)
(v) পশ্চিমবঙ্গ (করোনায় মৃত 20·5 হাজার)

[তথ্যসূত্র : *mygov.in/corona-data/covid-19-statewise-status*]

■ ***করোনায় সর্বনিম্ন মৃত্যুর সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কী কী?***

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে করোনায় সবচেয়ে কম মৃত্যু ঘটেছে, এমন পাঁচটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল —

(i) নাগাল্যান্ড (715 জন)
(ii) মিজোরাম (601 জন)
(iii) অরুণাচল প্রদেশ (286 জন)
(iv) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (129 জন)
(v) দাদরা ও নগরহাভেলি (4 জন) : ভারতে সর্বনিম্ন

[তথ্যসূত্র : *mygov.in/corona-data/covid-19-statewise-status*]

■ ***পশ্চিমবঙ্গের কোথায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক?***

কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপর উত্তর 24-পরগনা জেলা।

■ ***করোনা হটস্পট বলতে কী বোঝায়?***

যে সমস্ত জায়গায় করোনা সংক্রমণের ঘটনা বেশি, সেই জায়গাগুলিকে করোনা হটস্পট (corona hotspot) বলা হয়। যেমন— নতুন দিল্লি, মুম্বাই ইত্যাদি শহর।

■ ***করোনা রোগের সাপেক্ষে কনটেনমেন্ট জোন কী?***

যে সমস্ত অঞ্চলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বেশি, করোনা পজিটিভ মানুষের সংখ্যা বেশি, সেই অঞ্চলগুলিকে সংলগ্ন পড়শি এলাকা থেকে আলাদা করা হয়, যাতে স্থানীয়ভাবে করোনা সংক্রামিত না হয়। চিকিৎসা ও পরিসেবা দেওয়া এবং নজরদারির সুবিধার্থে এই বিচ্ছিন্ন করে রাখা নাগরিক এলাকাগুলিকে কনটেনমেন্ট জোন (containment zone) বলা হয়।

■ ***ভারতে জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত করোনা প্রতিষেধক মোট প্রদত্ত টিকার সংখ্যা কত?***

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে করোনা প্রতিষেধক মোট প্রদত্ত টিকার সংখ্যা প্রায় 165·7 কোটি।

■ *জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত ভারতে কত শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক (adult) নাগরিককে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে?*

ভারতে জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত 75 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক (adult) নাগরিককে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে।

■ *কোন্ ধরনের মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি?*

AIIMS (অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েনসেস, নতুন দিল্লি)-এর মতে সেই সব মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি—

(i) যাঁদের বয়স 60-এর বেশি;
(ii) যাঁদের লাং, কিডনি, লিভার ও হার্টের সমস্যা আছে;
(iii) যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে (hypertension-এ) ভোগেন;
(iv) যাঁদের মেদবহুল (মোটা) চেহারা (obesity);
(v) যাঁরা ডায়াবেটিসে (diabetes mellitus) ভোগেন।

■ *করোনায় স্বল্প আক্রান্ত যাঁরা (mild disease), তাঁদের দেখভাল করার প্রাথমিক নিয়ম কী?*

AIIMS (অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েনসেস, নতুন দিল্লি)-এর মতে করোনায় স্বল্প আক্রান্ত (mild disease) যাঁরা, অর্থাৎ যাঁদের জ্বর রয়েছে, তবে শ্বাসকষ্ট নেই, তাঁদের প্রাথমিক পরিচর্যার নিয়ম হল—

(i) তাঁরা লোকজনের সঙ্গে বিশেষ দরকার ছাড়া মিশবেন না — নিজেদের আলাদা করে (isolation) রাখবেন।
(ii) অন্যের হাঁচি কাশি ও নিজের হাঁচি কাশি থেকে যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।
(iii) হাত জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার রাখতে হবে।
(iv) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
(v) রক্তে অক্সিজেনের মাত্রার পরিমাপ বাড়িতেই করতে হবে।
(vi) শ্বাসকষ্ট ও কাশি বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

■ *করোনায় মোটামুটি আক্রান্তদের (moderate disease) ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিচর্যার বিধি কী?*

AIIMS (অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েনসেস, নতুন দিল্লি)-এর মতে করোনায় মোটামুটি আক্রান্ত যাঁরা, (moderate disease) অর্থাৎ—

(a) যাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে 24 বা তার বেশি, এবং
(b) ঘরের স্বাভাবিক পরিবেশে রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশন-এর মাত্রা (SpO_2) 94 শতাংশের কম, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিচর্যার বিধি হল—

  (i) করোনা হাসপাতালে রোগীকে ভরতি করতে হবে, এবং
  (ii) চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ, ইনজেকশন ও অক্সিজেন দেওয়া চলবে।

■ *করোনায় প্রচণ্ড আক্রান্তদের (severe disease) ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিচর্যার নিয়ম কী?*

AIIMS (অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েনসেস, নতুন দিল্লি)-এর মতে করোনায় প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত যাঁরা, (severe disease) অর্থাৎ—

(a) যাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে 30 বা তার বেশি, এবং
(b) ঘরের স্বাভাবিক পরিবেশে রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশন-এর মাত্রা (SpO_2) 90 শতাংশের কম, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিচর্যার বিধি হল—

(i) করোনা হাসপাতালের ICU (Intensive Care Unit) অর্থাৎ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রোগীকে ভরতি করতে হবে।

(ii) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ, ইনজেকশন ও অক্সিজেন দেওয়া চলবে।

■ ***করোনা ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়?***

করোনা ভাইরাস এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে সাধারণত চারটি ধাপে ছড়িয়ে পড়ে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যেমন—

প্রথম ধাপ : করোনা সংক্রামিত কোনো মানুষ যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যান এবং সেখানে ধীরে ধীরে করোনার সংক্রমণ ঘটান।

দ্বিতীয় ধাপ : করোনা আক্রান্ত মানুষেরা যখন হাঁচি কাশি, সর্দির ড্রপলেটের মাধ্যমে অন্যান্য মানুষকে সংক্রামিত করেন।

তৃতীয় ধাপ : করোনায় আক্রান্ত বহু মানুষ যখন নানা সমাবেশ, অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ওই সমাবেশে উপস্থিত থাকা আরও বহু মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেন।

চতুর্থ ধাপ : করোনার সংক্রমণ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

■ ***করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কোন্ কোন্ দেশ টিকা তৈরি করেছে?***

করোনা টিকা তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী দেশগুলি হল—

(i) ভারত :

(a) কোভিশিল্ড (Covishield) নামক টিকাটি ভারতের সিরাম ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া তৈরি করেছে। এই টিকার ওপর প্রাথমিক কাজ করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাসট্রা জেনেকা (Astra Zeneca) কোম্পানি।

(b) কোভ্যাকসিন (Covaxin) নামের টিকাটি ভারতের ভারত বায়োটেক নামক কোম্পানি তৈরি করেছে। এই টিকার ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ করেছে USA-র ফাইজার (Pfizer) এবং জার্মান বায়োটেক কোম্পানি বায়ো এন টেক (Bio N Tech)। প্রসঙ্গত, কোভিশিল্ড, কোভ্যাকসিন ও স্পুটনিক আই সি এম আর-এর ছাড়পত্র পেয়েছে। ভারত এখনও পর্যন্ত বিশ্বে উৎপাদিত মোট টিকার 17 শতাংশ উৎপাদন করছে। টিকা উৎপাদনে ভারতের স্থান চতুর্থ।

(ii) USA : এখানে ফাইজার কোম্পানির টিকা এবং মডারনা (Moderna) নামের আর একটি টিকা দেওয়ার কাজ চলছে। USA টিকা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

(iii) চিন : চিনের সিনোভ্যাক (Sinovac) কোম্পানি করোনার টিকা তৈরি করেছে। চিন টিকা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে।

(iv) রাশিয়া : রাশিয়ার তৈরি করোনা টিকার নাম হল স্পুটনিক 5 (Sputnik V)। টিকা উৎপাদনে UK তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

(v) UK : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাসট্রা জেনেকা কোম্পানির তৈরি টিকা ইংল্যান্ডে চলছে। টিকা উৎপাদনে UK তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

■ ***করোনা টিকা কী সবাই নিতে পারবেন?***

ভারতে পয়লা মার্চ 2020 থেকে প্রবীণদের করোনা টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। 18 বছর থেকে 60 বা তার বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়া চলছে। এখানেই কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে— কারণ অন্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও কী টিকা নিতে পারবেন— এজাতীয় প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে

(i) ক্যানসার, ডায়ালিসিস চলছে, বা অন্য কোনো জটিল রোগ রয়েছে, এমন ব্যক্তির করোনা টিকা নিতে অসুবিধে নেই।

(ii) প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট আছে, এমন মানুষও করোনা ভ্যাকসিন নেবেন।

(iii) গর্ভবতী মায়েরা করোনা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। ব্রেস্টফিড করাতেও পারবেন।

(iv) যার একবার করেনা হয়ে গেছে, তিনিও ভ্যাকসিন নেবেন।

(v) অ্যালার্জি থাকলেও করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া যায়।

■ ***করোনা থেকে সেরে ওঠার কতদিন পরে টিকা নেওয়া যায়?***

করোনা থেকে সেরে ওঠার তিন মাস পরে ভ্যাকসিন নেওয়া যায়।

■ ***করোনার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গ কী?***

SARS CoV 2 বা করোনা ভাইরাসের প্রথম আক্রমণের ঘটনাকে **প্রথম তরঙ্গ (1st wave)** বলা হয়। মার্চ 2020 তে ভারতে প্রথম তরঙ্গের ধাক্কা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

এপ্রিল 2021-এ করোনা সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, যা **দ্বিতীয় তরঙ্গ (2nd wave)** নামে পরিচিত। এই সময়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে করোনা বিধিনিষেধ (corona restrictions) চালু করেছে।

ভারতে নভেম্বর 2021 জানুয়ারি 2022-এ করোনা সংক্রমণের ঘটনা বেড়েছে। এই বৃদ্ধিটিকে করোনার **তৃতীয় তরঙ্গ (3rd wave)** বলা হয়। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে তৃতীয় তরঙ্গে করোনার সংক্রমণ বেশি ঘটেছে বল মনে করা হচ্ছে।

ভারতে এপ্রিল-মে, 2022 সালে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। অনেকে মনে করছেন এটি করোনার **চতুর্থ তরঙ্গ (4th wave)**।

■ ***ওমিক্রন (Omicron) কী?***

কোভিড-19 রোগ ছড়ায় যে SARS-CoV-2 ভাইরাস, তার একটি বিশেষ ধরন বা ভেরিয়েন্ট-এর (variant) নাম হল "ওমিক্রন" (Omicron)। অনেকে ওমিক্রনকে "ওমাইক্রন"-ও উচ্চারণ করছেন। ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট-এর (B.1.1.529) খবর প্রথম পাওয়া যায় 24 নভেম্বর 2021, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।

■ ***জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত কোভিড-19 ভাইরাসের কোন্ কোন্ ধরনের (variant) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?***

জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত কোভিড-19-এর প্রাপ্ত ধরনগুলি (variant) হল— আলফা, বিটা, গামা, ডেলটা এবং ওমিক্রন।

পরিশিষ্ট

8.1 ভারত ও বিশ্বের কিছু বিখ্যাত পরিবেশ কর্মী / বিজ্ঞানী / সংগঠক

নাম (যেখানকার মানুষ)	জীবনকাল	অবদান
সালিম আলি / সালিম মইজুদ্দিন আবদুল আলি (Salim Ali / Salim Moizuddin Abdul Ali) (ভারতীয় — মহারাষ্ট্র)	1896–1987	ইনি ভারতের প্রথম পক্ষী বিশারদ যিনি দেশের পাখিদের সম্পর্কে সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তিনি Birdman of India নামে পরিচিত। তাঁর লেখা অন্যতম বিখ্যাত বই হল The Book of Indian Birds (1941 সালে প্রথম প্রকাশিত)।
যাদব পায়েং / যাদব মোলাই পায়েং (Jadav Payeng / Jadav Molai Payeng) (ভারতীয় — আসাম)	1963–	ইনি Forest Man of India নামে পরিচিত। ইনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে অবস্থিত মাজুলি দ্বীপের 5.5 বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে কয়েক হাজার বাঁশ, অর্জুন ও অন্যান্য গাছ পুঁতেছেন ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। যে কারণে এই কৃত্রিম বনভূমি তাঁর নামে ''মোলাই'' বন (Molai Forest) নামে পরিচিত হয়েছে। তাঁর এই কাজের ফলে মাজুলি দ্বীপের ক্ষয় বন্ধ হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ফিরে এসেছে।
রাজেন্দ্র সিং (Rajendra Singh) ভারতীয় — রাজস্থান	1959–	ইনি Waterman of India নামেও পরিচিত। তিনি ও তাঁর NGO — তরুণ ভারত সঙ্ঘ — রাজস্থানের শুষ্ক আলোয়ার ও সন্নিহিত অঞ্চলে জলসম্পদ সংরক্ষণে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। তিনি এখানে প্রায় 4500-এর মতো জলাশয় — স্থানীয় নাম ''জোহাড়'' (Johad) — সংরক্ষণ করেছেন, যা বৃষ্টির জল ধরে রাখে। জলসেচ, পানীয় জল ও গৃহস্থালির জল সরবরাহে কাজে লাগে এবং ভৌমজল স্তরের উন্নতি ঘটায়।
মারিমুথু যোগনাথন (Marimuthu Yoganathan) (ভারতীয় — তামিলনাড়ু)	1969–	ইনি The Tree Man নামে পরিচিত। ইনি পেশায় বাস কনডাক্টর হলেও তাঁর উপার্জনের প্রায় 40 শতাংশ গাছ কেনা, গাছ লাগানো ও তাদের সংরক্ষণের জন্য খরচ করেন। তাঁর লাগানো গাছের সংখ্যা প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার।
গৌড়া দেবী (Gaura Devi) (ভারতীয় — উত্তরাখণ্ড)	1925–1991	এই মহিলা 1974 সালে বর্তমান উত্তরাখণ্ডের (পূর্বতন উত্তরপ্রদেশের) রেনি গ্রাম সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেআইনি গাছ কাটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, যা পরে চিপকো (Chipko) আন্দোলন নামে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়।
কিংক্রি দেবী (Kinkri Devi) (ভারতীয় — হিমাচল প্রদেশ)	1925–2007	এই দরিদ্র দলিত মহিলা পেশায় প্রথম জীবনে সাফাই কর্মী ছিলেন। হিমাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় চুনাপাথরের বেআইনি খনিগুলির বিরুদ্ধে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আইনি লড়াই শুরু করেন। এই আইনি উদ্যোগ শুরু করার জন্য তিনি সিমলা আদালতের সামনে 19 দিন অনশন করেন। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলাটি চলে ও কিংক্রি দেবীর আবেদন সুবিচার পায়।
মেধা পাটকর (Medha Patkar) (ভারতীয় — মহারাষ্ট্র)	1954–	এই সমাজসেবিকা 1985 সাল থেকে নর্মদা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে স্থানীয় আদিবাসী দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষেরা যে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা চাষের ও বসবাসের জমি হারাবে, সেই সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন যা পরে ''নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' নামে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়।

নাম (যেখানকার মানুষ)	জীবনকাল	অবদান
		এছাড়া তিনি মুম্বাইতে বস্তিবাসী মানুষদের আস্তানা নির্মাণের জন্য ''ঘর বাঁচাও ঘর বানাও আন্দোলন'' শুরু করেন। এই আন্দোলন 2005 সালে মুম্বাইতে শুরু হয়।
বন্দনা শিবা (Vandana Shiva) (ভারতীয় — উত্তরাখণ্ড, দিল্লি)	1952–	ইনি পরিবেশবিদ ও লেখিকা। তাঁর ''নবধান্য'' (Navdanya) নামে একটি NGO আছে, যার মাধ্যমে তিনি দেশীয় শস্য প্রজাতির সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করেন। কাজ করেন। তিনি Genetically Modified (GM) শস্যের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেন।
সুন্দরলাল বহুগুণা (Sundarlal Bahuguna) (ভারতীয় — উত্তরাখণ্ড)	1927–2021	ইনি পরিবেশবিদ ও চিপকো আন্দোলনের নেতা। তিনি তেহরি প্রকল্পের পরিবেশগত সমস্যা নিয়েও আন্দোলন করেছেন।
চন্ডী প্রসাদ ভাট/ভট্ট (Chandi Prasad Bhatt) (ভারতীয় — উত্তরাখণ্ড)	1934–	ইনি উত্তরাখণ্ডের গোপেশ্বর নামক স্থানে ''দশোলি গ্রাম স্বরাজ্য মণ্ডল'' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংস্থাটি হিমালয়ের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়নের কাজ করে। চিপকো আন্দোলনের সঙ্গেও সংস্থাটি জড়িত হয়। National Forest Mission-এর কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত।
তুলসী গৌড়া (Tulsi Gowda) (ভারতীয় — কর্ণাটক)	1944–	এঁকে Encyclopedia of Forest বলা হয়। বনের গাছপালা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান রয়েছে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলার। কর্ণাটকের বন দপ্তরের সঙ্গে তিনি একসময়ে যুক্ত ছিলেন। গাছ চেনা ও গাছ থেকে সঠিক সময়ে বীজ সংগ্রহ করায় তাঁর জুড়ি নেই। তিনি সারা জীবনে এক লক্ষেরও বেশি গাছ পুঁতেছেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাঁকে খালি পায়ের পরিবেশবিদ-ও (Barefoot environmentalist) বলা হয়।
বুলু ইমাম (Bulu Imam) (ভারতীয় — ঝাড়খণ্ড)	1942–	এই পরিবেশবিদ মানুষটি ঝাড়খণ্ডে, বিশেষত উচ্চ দামোদর উপত্যকার করণপুরা অঞ্চলে পাথর খাদানগুলি কীভাবে পরিবেশের গুণমান নষ্ট করছে, সেবিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁর কাজ দেশ ও বিদেশে সম্মানিত হয়েছে।
যমুনা টুডু (Jamuna Tudu) (ভারতীয় — ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা)	1980–	পরিবেশপ্রেমী এই মহিলা যেভাবে বেআইনি গাছ কাটা বন্ধ করতে দলবদ্ধ গুন্ডাবাহিনী ও নকশালদের মোকাবিলা করেন, সেই সাহস ও দক্ষতার জন্য তাঁকে অনেকে "Lady Tarzan"-ও বলেন। বনবিনাশের বিরুদ্ধে তাঁর এই সংগ্রাম ঝাড়খণ্ডের অরণ্য ও জীববৈচিত্র্যকে যথাসম্ভব সুরক্ষা দেয়।

প্রশ্নাবলি

(A) মাল্‌টিপ্‌ল চয়েস কোয়েস্‌চেনস্‌ (MCQ)

1. ভারতে কোন্ দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে?
(A) ব্যারেন (B) ব্যারন
(C) ব্যারিকেন (D) ব্যারন্‌স

2. পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেখানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি, তাকে বলে–
(A) ফোকাস (B) এপিসেন্টার
(C) অ্যান্টিসেন্টার (D) সেন্টার

3. ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠের ওপরের স্থানটিকে বলা হয়–
(A) ফোকাস (B) এপিসেন্টার
(C) অ্যান্টিসেন্টার (D) সেন্টার

4. ভূগোলকের ওপরে উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টারের ঠিক বিপরীত স্থানটিকে বলা হয়–
(A) ফোকাস (B) এপিসেন্টার
(C) অ্যান্টিসেন্টার (D) সেন্টার

5. গ্রিক শব্দ "সিস্‌মোস" কথাটির অর্থ হল–
(A) অগ্ন্যুৎপাত (B) উষ্ণ প্রস্রবণ
(C) ভূকম্পন (D) জলোচ্ছ্বাস

6. মান্নার উপসাগর, কচ্ছ উপসাগর, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ– ভারতের এই চারটি অঞ্চলেই নিম্নলিখিত কোন্‌টি দেখা যায়?
(A) প্রবাল (B) নুড়ি পাথর
(C) আগ্নেয়গিরি (D) সুনামি

7. একটি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় হল–
(A) ধস (B) বন্যা
(C) খরা (D) সন্ত্রাসবাদ

8. মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণ হল–
(A) বনহনন
(B) পশুচারণ
(C) অশিক্ষা ও উদাসীনতা
(D) অনাস্থা

9. পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল যে দুর্যোগের জন্য পরিচিত–
(A) ধস (B) বন্যা
(C) দুর্ঘটনা (D) পর্যটন

10. ভারতের প্রায় কত শতাংশ এলাকা খরাপ্রবণ?
(A) 10 শতাংশ (B) 20 শতাংশ
(C) 29 শতাংশ (D) 48 শতাংশ

11. আরবি কোন্ শব্দ থেকে **'Hazard'** কথাটি এসেছে, যার বাংলা অর্থ হল দুর্যোগ?
(A) Az-zahr (B) Ha-zahr
(C) Az-zard (D) Haz-zard

12. সুনামি কোন্ দেশের শব্দ?
(A) ইন্দোনেশিয়া (B) জাপান
(C) অস্ট্রেলিয়া (D) শ্রীলঙ্কা

13. ইনটারন্যাশনাল ডে ফর ন্যাচারাল ডিজাস্‌টার রিডাক্‌সন এবং ভারতে ডিজাস্‌টার রিডাক্‌সন ডে **(Disaster Reduction Day)** অর্থাৎ বিপর্যয় লঘুকরণ দিবস কবে পালিত হয়?
(A) 10 জানুয়ারি (B) 30 এপ্রিল
(C) 15 মে (D) 13 অক্টোবর

14. ভারতে ডিজাস্‌টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট **(Disaster Management Act)** কোন্ সাল থেকে চালু করা হয়?
(A) 1995 (B) 2001
(C) 2005 (D) 2010

15. **BPR** ও **DART** পদ্ধতি ও যন্ত্রটি কোন্ দুর্যোগের ওপর লক্ষ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়?
(A) অগ্ন্যুৎপাত (B) সুনামি
(C) ধস (D) দাবানল

16. বন্যা যে ধরনের বিপর্যয়–
(A) প্রাকৃতিক (B) আধা-প্রাকৃতিক
(C) মনুষ্যসৃষ্ট (D) মহাজাগতিক

17. যে ল্যাটিন শব্দ থেকে ইংরেজি **Disaster** কথাটি এসেছে–
(A) Disastre (B) Disastri
(C) Diastere (D) Disestri

18. ভারতে কোন্ সালে জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (National Flood Control Programme) চালু করা হয়?
(A) 1947 (B) 1954
(C) 1976 (D) 1996

19. ভারতের ভূমিকম্পের তীব্রতাবোধক অঞ্চল অনুযায়ী কলকাতা যে অঞ্চলের অন্তর্গত–
(A) জোন-I (B) জোন-II
(C) জোন-III (D) জোন-IV

20. ভারতের ভূমিকম্পের তীব্রতাবোধক অঞ্চল অনুযায়ী সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত যে অঞ্চলের অন্তর্গত–
(A) জোন-II (B) জোন-V
(C) জোন-IV (D) জোন-I

21. ভূমিকম্পের 'ফোকাস'-এর অন্য নাম কী?
(A) এপিসেন্টার (B) অ্যান্টিসেন্টার
(C) সেন্টার (D) হাইপোসেন্টার

22. বিপর্যয় মোকাবিলায় SDRF কার দায়িত্বে?
(A) কেন্দ্র (B) রাজ্য
(C) জেলা (D) ব্লক

23. বিপর্যয় মোকাবিলায় NDRF কার দায়িত্বে?
(A) রাজ্য (B) ব্লক
(C) কেন্দ্র (D) জেলা

24. বিপর্যয় মোকাবিলায় QRT হল–
(A) Quick Response Team
(B) Quick Recovery Task
(C) Quad Repair Tool
(D) Quasi Rural Tact

25. ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য পেতে যে কৃত্রিম উপগ্রহ খুব কার্যকর–
(A) METEOSAT (B) GPS
(C) NAVIC (D) OCEANSAT

26. মানুষের যে কাজের জন্য নদীপাড়ের ভাঙন বাড়ে–
(A) খাল খনন করা
(B) নদীখাত থেকে বালি, পাথর তোলা
(C) নদীর ধারে ময়লা ফেলা
(D) জেটি নির্মাণ করা

27. কোনো রোগের ব্যাপ্তি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বোঝাতে যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়–
(A) Pandemic (B) Epidemic
(C) Isodemic (D) Academic

28. The Book of Indian Birds বইটি লিখেছেন–
(A) R K Narayan
(B) Ruskin Bond
(C) Salim Ali
(D) Salman Rushdie

29. পশ্চিমবঙ্গে যে সমুদ্রতটে ভাঙনের সমস্যা আছে–
(A) দিঘা (B) পুরী
(C) গোপালপুর (D) বিশাখাপত্তনম

30. ভারতের কোন্ রাজ্য করোনায় সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে?
(A) পশ্চিমবঙ্গ (B) মহারাষ্ট্র
(C) কেরল (D) গোয়া

31. করোনার প্রথম তরঙ্গ ভারতে কবে এসেছে?
(A) এপ্রিল 2021 (B) মার্চ 2018
(C) মার্চ 2020 (D) জুন 2016

32. SARS – CoV-2 ভাইরাসের একটি ধরন (variant) হল–
(A) ডেক্রন (B) মাইক্রন
(C) মিউক্রন (D) ওমিক্রন

33. ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কবে ঘটেছিল?
(A) 12 জানুয়ারি 1970
(B) 31 ডিসেম্বর 1979
(C) 2/3 ডিসেম্বর1984
(D) 15 আগস্ট 1995

34. আবহাওয়াভিত্তিক খরা হতে গেলে ন্যূনতম যত শতাংশ স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হওয়া দরকার–
(A) 26% (B) 50%
(C) 65% (D) 80%

35. ভারতীয় উপমহাদেশে কোন্ মরুভূমির আয়তন বাড়ছে?
(A) সাহারা (B) কালাহারি
(C) থর (D) মোজাভে

36. 'থ্রি-মাইল আইল্যান্ড বিপর্যয়' কোথায় ঘটেছিল?
(A) জাপানে (B) ইরানে
(C) চিনে (D) USA

37. কোন্ নদীটি মৃত বলে ঘোষিত হয়েছে?
(A) ইছামতী (B) রায়মঙ্গল
(C) বিদ্যাধরী (D) হলদি

38. ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হল–
(A) অধিক বৃষ্টিপাত (B) অধিক বায়ুপ্রবাহ
(C) জমির অধিক ঢাল (D) সবকটিই ঠিক

39. গাছপালা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের জন্য কাকে Encyclopedia of forests বলা হয়?
(A) বন্দনা শিবা (B) অরুন্ধতী রায়
(C) শিবকালী ভট্টাচার্য (D) তুলসী গৌড়া

40. খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার হয়–
(A) বড়ো বাঁধ নির্মাণ
(B) অনেক খাল কাটা
(C) অনেক পুকুর কাটা
(D) শুষ্ক কৃষিতে জোর দেওয়া

41. রাশিয়ার তৈরি করোনা টিকার নাম হল–
(A) ব্রাম্মোস (B) মস্কোভা
(C) স্পুটনিক (D) টলস্টয়

42. ফুকুসিমা বিপর্যয় কোন্ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত?
(A) পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে দুর্ঘটনা
(B) আণবিক বোমার বিস্ফোরণ
(C) সুনামির কারণে দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হওয়া
(D) বাঁধ ভেঙে বন্যা

43. করোনার কারণে বিশ্বে গড় মৃত্যুহার হল–
(A) 25% (B) 15%
(C) 2·1% (D) 1·2%

44. ভারতের একটি অতি খরাপীড়িত রাজ্য হল–
(A) বিহার (B) আসাম
(C) মেঘালয় (D) গুজরাট

45. অনুর্বর জমি বা ওয়েস্টল্যান্ড সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল–
(A) ভূমিক্ষয়
(B) পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন
(C) বন্দর নির্মাণ
(D) অতিরিক্ত ভৌমজলের ব্যবহার

46. বনবিনাশের ফলে মাটির যা নষ্ট হয়–
(A) উর্বরতা (B) লবণতা
(C) অম্লত্ব (D) রং

47. বনভূমি বিনষ্ট হলে যে দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়ে–
(A) হড়পা বান (B) দাবানল
(C) শিলাবৃষ্টি (D) ঘূর্ণিঝড়

48. ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় যে গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল–
(A) O_3 (B) CO
(C) MIC (D) CH_4

49. ভারতের একটি অতি বন্যাপীড়িত রাজ্য হল–
(A) পাঞ্জাব (B) কেরালা
(C) পশ্চিমবঙ্গ (D) মণিপুর

50. নিম্নলিখিত কোন্‌টি ভারতের লবণ জলের স্থলভাগের জলাভূমি?
(A) মানস সরোবর (B) সম্বর হ্রদ
(C) চিলিকা হ্রদ (D) লোকটাক হ্রদ

51. জলাভূমিকে মানবদেহের যে অংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়?
(A) মাথা (B) বুক
(C) কিডনি (D) লিভার

52. ভারতের কোথায় ধসের সমস্যা রয়েছে–
(A) রাজস্থান (B) গোয়া
(C) পশ্চিমবঙ্গ (D) অন্ধ্রপ্রদেশ

53. চের্নোবিল দুর্ঘটনা কোন্ দেশে ঘটেছিল?
(A) ইউক্রেন (B) রাশিয়া
(C) গ্রিস (D) তুরস্ক

উত্তরমালা

1. (A)	2. (A)	3. (B)	4. (C)	5. (C)	6. (A)	7. (D)	8. (C)	9. (A)	10. (C)
11. (A)	12. (B)	13. (D)	14. (C)	15. (B)	16. (B)	17. (A)	18. (B)	19. (C)	20. (B)
21. (C)	22. (B)	23. (C)	24. (A)	25. (A)	26. (B)	27. (A)	28. (C)	29. (A)	30. (B)
31. (C)	32. (D)	33. (C)	34. (A)	35. (C)	36. (D)	37. (C)	38. (B)	39. (D)	40. (D)
41. (C)	42. (A)	43. (C)	44. (D)	45. (A)	46. (A)	47. (A)	48. (C)	49. (C)	50. (B)
51. (C)	52. (C)	53. (A)							

(B) *সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন* (Very Short Questions)

1. ধস নামার দুটি কারণ দাও। [প্রচুর বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢালে অবাধে গাছ কেটে ফেলা]

2. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ধস নামার ঘটনা বেশি ঘটে? [দার্জিলিং]

3. ভূমিকম্পের দুটি কারণ হল— [চলমান পাতের জন্য, অগ্ন্যুৎপাতের জন্য]

4. ভূমিকম্পের কোন্ তরঙ্গটি সবচেয়ে শক্তিশালী? [পি-তরঙ্গ]

5. ভূমিকম্পের কোন্ তরঙ্গটি সবচেয়ে দুর্বল? [এস-তরঙ্গ]

6. ভূমিকম্প মাপার জন্য কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? [সিসমোগ্রাফ]

7. মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল কোন্ কাজে লাগে? [ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য]

8. ভূমিক্ষয়ের জন্য দুটি কারণ হল— [খুব খাড়াই ঢাল, বনভূমির বিলোপ]

9. আঁধি কী? [উত্তর ভারতের ঘূর্ণিঝড়]

10. টর্নেডো কী? [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘূর্ণিঝড়]

11. এল নিনো কী? [দুই থেকে সাত বছর অন্তর ডিসেম্বর মাস নাগাদ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পেরুর উপকূলে সৃষ্ট উষ্ণ সমুদ্রস্রোত]

12. সাদার্ন অসিলেশন বা দক্ষিণ দোলন কী? [দক্ষিণ গোলার্ধে এল নিনোর প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলে তাপ ও চাপের অস্বাভাবিক পরিবর্তন]

13. পি-তরঙ্গের গড় গতিবেগ কত? [প্রতি সেকেন্ডে 6 কিলোমিটার]

14. এস-তরঙ্গের গড় গতিবেগ কত? [প্রতি সেকেন্ডে 3·5 কিলোমিটার]

15. মার্কালি স্কেল ও রিখটার স্কেল কোন্ কাজে লাগে? [ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য]

16. লাভ তরঙ্গ কী? [লাভ তরঙ্গ হল ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত পাশাপাশিভাবে ঢেউ খেলানো এক ধরনের ভূকম্পীয় এস-তরঙ্গ।]

17. পৃথিবীর কতগুলি দেশে বর্তমানে মরুভূমির এলাকা বেড়ে চলেছে? [100 টি দেশ]

18. প্রতি বছর কতটা জমি মরুভূমির সম্প্রসারণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? [গড়ে 2 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার]

19. ড্রেজিং কথাটির অর্থ কী? [নদীর গভীরতা রক্ষা করার জন্য নদীর তলা থেকে যন্ত্রের সাহায্যে পলি কাটার পদ্ধতিকে ড্রেজিং বলে]

20. সোয়াশ কাকে বলে? [উপকূলের ওপরে ঢেউ আছড়ে পড়ার পরে উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্মুখবর্তী স্রোতকে সোয়াশ বলে]

21. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় উপকূলের ভাঙন বেশি হয়? [দিঘার উপকূল, হুগলি নদীর মোহনা, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ]

22. সাম্প্রতিককালে গুজরাটে ভূমিকম্প কবে হয়েছে? [26 জানুয়ারি 2001]

23. খরা ও অনাবৃষ্টির মধ্যে তফাত কী? [বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের 75% কম বৃষ্টিপাত হলে খরা হয়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাব হল অনাবৃষ্টি]

24. মৃত্তিকাক্ষয় বা ভূমিক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণগুলি কী কী? [অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, বায়ুপ্রবাহজনিত ক্ষয়, ধস ইত্যাদি]

25. ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চিনের একটি করে বন্যাপ্রবণ নদীর উদাহরণ দাও। [(A) ভারত —গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র; (B) বাংলাদেশ—পদ্মা; (C) পাকিস্তান—সিন্ধু; (D) চিন — হোয়াং হো]

26. ওড়িশায় সুপার সাইক্লোন বা প্রবল ঘূর্ণিঝড় কবে হয়েছিল? [1999 সালে]

27. বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে **PMR** কী? [P হল Preparation অর্থাৎ প্রস্তুতিকরণ, M হল Mitigation বা প্রশাসন এবং R হল Recovery বা পুনরুদ্ধার।]

28. বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে **CBM** এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম কী? [Community Based Mitigation]

29. **GPS** এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম কী? [Global Positioning System]

30. **CAZRI** এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম কী? [Central Arid Zone Research Institute]

31. **GIS** এই সংক্ষিপ্ত নামটির পূর্ণনাম কী? [Geographic Information System]

32. কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে **RS**-এর অর্থ কী? [Remote Sensing]

33. পশ্চিমবঙ্গের চারটি আবহাওয়াগত দুর্যোগ কী? [বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি]

34. ভারতের কোন্ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি? [ভারতের পূর্ব উপকূল]

35. হিমালয় অঞ্চল কোন্ কোন্ দুর্যোগের জন্য পরিচিত? [ধস, বন্যা, হড়পা বান, ভূমিকম্প]

36. ভারতে সাম্প্রতিক অতীতে কোন্ সালে সুনামির বিপর্যয় ঘটেছিল? [2004 সালে (26 ডিসেম্বর)]

37. আয়লা, ফাইলিন, হুদহুদ কী জন্য পরিচিত? [এরা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়]

38. সিয়াচেন অঞ্চলে কোন্ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা বেশি? [হিমানী সম্প্রপাত বা অ্যাভালনচ (Avalanche)]

39. বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ইংরেজি কোন্ শব্দে প্রকাশ করা হয়? [রেজিলিয়েন্স (Resilience)]

40. ভারতে জাতীয় স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? [National Disaster Management Authority]

41. ভারতে জাতীয় স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ত্রাণ ও উদ্ধারে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন্ সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে? [National Disaster Response Force]

42. **Asian Disaster Preparedness Centre** কবে ও কোথায় গড়ে তোলা হয়? [1986 সালে ব্যাংকক, থাইল্যান্ড]

43. ভারতে কোন্ সংস্থা ভূমিকম্পের ব্যাপারে নজর রাখে? [India Meterological Department]

44. বিপর্যয় মোকাবিলায় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? [United Nations Disaster Relief Organization]

45. **UNDRO**-এর পুরোনাম কী? [United Nations Disaster Rehabilitation Organization]

7.6. পরিবেশ শিক্ষা এবং সচেতনতা (Environmental Education and Public Awareness)

পরিবেশের শব্দগত অর্থ হল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ যে সমস্ত বাহ্যিক শর্ত মানুষ, উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিকাশকে প্রভাবিত করে (আলোক, তাপমাত্রা, জল ও মৃত্তিকা)। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মতে, "The environment is every thing that affects the individual except his genes." পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেমন—প্রাকৃতিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। অনুকূল পরিবেশে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যে বাতাবরণ শিশুর মানসিক বিকাশের সহায়ক, তাকে মানসিক পরিবেশ বলে। যেমন—পঠনরত কোনো শিশুর চরিত্র গঠনে লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার ইত্যাদি আনন্দদায়ক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পাঠক্রমে সাহায্য করে। তাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকের দায়িত্ব এই সকল কর্মসম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে যেহেতু পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই শিক্ষার একটি নতুন দিক উন্মোচিত হল, যা পরিবেশ শিক্ষা নামে পরিচিত। পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন দিক। পরিবেশ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল, শিশুর মান ও তার আশেপাশের বা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও বোধগম্যতার উন্নতিবিধান করা। পরিবেশ শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান, বোধগম্যতা, দক্ষতা এবং সচেতনতা সম্পর্কিত শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা বলতে পরিবেশ দূষণ, সম্পদ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনাকে বোঝায়। পরিবেশ শিক্ষাকে বলা যায়, পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা, পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা এবং পরিবেশের জন্য শিক্ষা। পরিবেশ শিক্ষা সাধারণত আমাদের শেখায়, কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রিয়া করে এবং এই পরিবেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য (Sustainable living) কীভাবে মানুষ তার আচরণ ও বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এটি শিক্ষার একটি বিষয়বস্তু, আবার শিক্ষার একটি রীতি, উভয়ই বলা যায়। রীতি হিসেবে ধরলে এটি শিক্ষণ-শিখনের সহায়ক উপকরণ এবং শিক্ষার একটি পথ। আবার বিষয়বস্তু হিসেবে এটি পরিবেশ ও তার উপাদান সম্পর্কে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, প্রাকৃতির ভারসাম্য রাখতে, প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়। এ ছাড়া পরিবেশ শিক্ষা যথোপযুক্ত পরিবেশ পরিকল্পনা করতে শেখায়, যা পরিবেশকে শুধু ব্যবহারযোগ্যই করে না, সৌন্দর্যের দিক থেকেও তাকে করে তোলে উপভোগ্য। এই কারণে পরিবেশ শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং এর ব্যাপ্তিও অনেকখানি। এর মাধ্যমে মানুষ তার জ্ঞান ও যুক্তিতথ্যের দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সাধ্য সমাধানের প্রচেষ্টা করে।

'পরিবেশ শিক্ষা' শব্দটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন সংজ্ঞাও নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারণাটি স্পষ্ট করার জন্য অনেক সংজ্ঞার মধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

1. আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘ **(International Union for Conservation of Nature, IUCN)**-এর মতে, "The process of recognizing values and clarifying the concept in order to develop skills and appreciate the interrelatedness of man, his culture and his biophysical surroundings. It also entails practice in decision-making and self-formulation of a code of behaviour about problems and issues concerning environmental quality." অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা হল মানুষ ও তার সাংস্কৃতিক এবং তার জীব-ভৌত পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্ব বা মর্যাদা অনুধাবন করার ও এই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা অর্জনের একটি পদ্ধতি। তদুপরি এটি পরিবেশগত সমস্যা ও পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য মানুষের নিজস্ব আচরণের নীতি নির্ধারণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলনকে উদ্‌বুদ্ধ করে।
2. **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)**, 1976-এর মতে, "Environmental education is a way in implementing the goals of environmental protection. It is not a separate branch of science or field of study. It should be carried out according to the principles of the life-long integral education." অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার একটি পথ। এটি বিজ্ঞান বা শিক্ষার আলাদা কোনো শাখা নয়। এই শিক্ষা অখণ্ড ও সারা জীবনব্যাপী হওয়া প্রয়োজন।
3. **জাতীয় পরিবেশগত শিক্ষা প্রকৌশল (National Strategy for Environmental Education, 2010)**-এর মতে, "Environmental education is a multi-disciplinary approach to learning that develops the knowledge, awareness, attitudes, values and skills that will enable individuals and the community to contribute towards maintaining and improving the quality of the environment." অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে (ভৌতবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করে; মানুষ ও মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা, জ্ঞান, দক্ষতা, প্রয়োজনীয় মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যাতে সে বা তারা পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development) করতে পারে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশগত শিক্ষা আইনের (US Environmental Education Act, 1970) বিষয়ক্রম অনুসারে 'পরিবেশ শিক্ষা' হচ্ছে একটি শিক্ষা পদ্ধতি যেটা মানুষের স্বাভাবিক ও তার দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে ও সমগ্র মানব পরিবেশের সঙ্গে জনসংখ্যা, দূষণ,

সম্পদ বণ্টন ও শোষণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং শহুরে ও গ্রাম্য পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও আলোচনা করে।

উপরের আলোচনা ও সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাই—

- পরিবেশ শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ, মনোভাব, আচরণকে প্রভাবিত করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের তৈরি পরিবেশের সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও সচেতনতা প্রদান করে।
- পরিবেশ শিক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূগোল, সামাজিক শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বহু বিষয়ের সাহায্যে পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এ ছাড়া ভৌত-জৈব পরিবেশ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সক্রিয়তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়।
- এটি একটি জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা মাধ্যম বা প্রক্রিয়া যা বিদ্যালয়-পূর্ব স্তর থেকে শুরু করে প্রচলিত প্রথাগত ও অপ্রচলিত প্রথাগত ইত্যাদি সকল শিক্ষাস্তরে চলতে থাকে।
- পরিবেশ শিক্ষা স্থানীয়, আঞ্চলিক, দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় স্তরে বিভিন্ন পরিবেশগত বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিবেশ ও তার সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।
- পরিবেশ শিক্ষায় বিভিন্ন প্রথাগত, প্রথামুক্ত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(ক) প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষা

স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্তরে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পারে। UNESCO-এর Tbilisi বৈঠক অনুসারে, প্রাইমারি স্কুল স্তরে রাখা হয়েছে জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই বিষয়গুলি পরিবেশের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কযুক্ত।

মাধ্যমিক স্কুল স্তর: প্রাইমারি স্কুল স্তরের উপর ভিত্তি করে আরও বিশদভাবে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিষয়গুলি বিশ্লেষিত হবে এই স্তরে। সমস্যাসমাধান ও দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর: পরিবেশের সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে স্থিতিশীল বিকাশের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই স্তরে।

পরিবেশ শিক্ষার গণ্ডির মধ্যে প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় শিক্ষা অন্তর্গত। প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে চারটি বিভিন্ন কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদান রয়েছে এবং এই উপাদানগুলি শিক্ষার চারটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

- পরিবেশ সচেতনতা—প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত,
- পরিবেশ ও বাস্তবজীবন—মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত,
- সম্পদের সংরক্ষণ—উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত,
- ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ—উচ্চশিক্ষার সঙ্গোক যুক্ত।

(খ) প্রথামুক্ত পরিবেশ শিক্ষা

প্রথাগত শিক্ষার বাইরে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ পরিবেশ শিক্ষা পেতে পারে বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদি ছাপা সামগ্রীর মাধ্যমে, শব্দ-দৃশ্যমাধ্যম, যেমন—রেডিয়ো বা টেলিভিশন (ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল, অ্যানিমাল প্ল্যানেট প্রভৃতি) ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে।

(গ) প্রথাবহির্ভূত পরিবেশ শিক্ষা

বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষ পরিবেশ শিক্ষা পেতে পারে। অপ্রথাগত শিক্ষার মধ্যে বয়স্ক শিক্ষা, গ্রামীণ যুব উপজাতি সম্পর্কিত, প্রশাসনিক সম্পর্কিত, বিভিন্ন শিক্ষাক্রম ও বিভিন্ন চাকরি অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে যাচ্ছে শিক্ষা ও বিজ্ঞান। কেননা, পরিবেশ ও শিক্ষা উভয়ের সঙ্গো বিকাশ সম্পর্কিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে, পরিবেশ শিক্ষা মূল তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং এদের প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট স্তর বা পর্যায় আছে।

(ক) এটি একটি এমন শিক্ষা যে শিক্ষায় পরিবেশ একটি অর্থ সরবরাহ করে।

(খ) এটি পরিবেশকে সঙ্গো নিয়ে শিক্ষা।

(গ) একটি বিশেষ মানের পরিবেশে বসবাসকারী একটি ব্যক্তিমানুষ যিনি সেই পরিবেশের বিশেষ মান রক্ষা করার জন্য নিজেও কিছুটা দায়ী।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এক কথায় 'পরিবেশ শিক্ষা'-র সংজ্ঞা দেওয়া সহজ কাজ নয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো পরিবেশ শিক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কী হবে তা কখনোই সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। যাইহোক, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং অন্যান্য মানবসম্পদ ইত্যাদি সবকিছুর একটা সংমিশ্রিত আলোচনা হচ্ছে 'পরিবেশ শিক্ষা'। জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যার সমাধান মানুষ নিজেই করতে পারবে।

7.6.1. পরিবেশ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে বিবৃত করা হল।

- এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গো নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করে।

- এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ তার সচেতনতা, দক্ষতা, ব্যবহার, প্রাক্ষোভিক মূল্য এবং সততার মধ্য দিয়ে পরিবেশের উন্নতিবিধান করে।
- পরিবেশ শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক, জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধগম্যতার সঞ্চার হয় এবং বাস্তব জীবনের গুরুত্ব আলোকিত করতে পথপ্রদর্শকের কাজ করে।
- এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সুবিধাজনক বিকাশের পথ প্রশস্ত করা যায়।
- পরিবেশ শিক্ষা জীবন ও তার মূল্য সম্পর্কিত গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করে।
- এই শিক্ষা শিশুকে পরিবেশের বিভিন্ন জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে।
- এটি পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও তার সমাধানের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উৎসাহিত করে।
- এই শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের দক্ষতা প্রদান করে।
- এটি ভাঙন বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের অসাম্যাবস্থা দূরীকরণে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার ঘটায়।
- এই শিক্ষা প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

7.6.2. পরিবেশ শিক্ষার পরিধি (Scope of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশ ও তার সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে ও পরিবেশের সমস্যা নিবারণ এবং সমাধানের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা, জ্ঞান ও মনোভাব তৈরি করার শিক্ষা দেয়। যে ক্ষেত্রগুলিতে 'পরিবেশ শিক্ষা' কাজ করে সেইসব ক্ষেত্রগুলিকে তার কর্মপরিধি জুড়ে থাকে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পরিবেশ শিক্ষা কাজ করে থাকে।

(ক) **জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির হার:** জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পরিবেশগত সমস্যার একটি সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত শোষণ হয়। একইভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ, ভূসম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় না।

(খ) **দূষণ:** বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ যথা—স্থলদূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ও তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব পরিবেশকে ক্রমশ অবনমিত করছে, যে সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সর্বোপরি যেগুলি মানবজীবনের সুস্থতাকে ব্যাহত করছে—এ সবই পরিবেশ শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ শিক্ষায় দূষণের বিভিন্ন কারণগুলি ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(গ) **জনস্বাস্থ্য ও জীবনের মান:** জনস্বাস্থ্য ও জীবনের মান পরিবেশের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। জিনগত ব্যাপার ছাড়াও পরিবেশগত নানান প্রভাবে

মানুষের
পরিবেশ,
(ঘ) **মানুষের**
পরিবেশগ
গুরুত্বপূর্ণ।
পারে বা
বিভিন্ন
বিশ্লেষণ-
(ঙ) **আইন:**
তোলা বা
আইন তৈ
দরকার যা
না পারে।
(চ) **সম্পদ:**
ও খনিজ
সম্পদের
সম্পদের
বিভিন্ন রী
যেমন—জ
শক্তি সম্প
এসবই নি
(ছ) **পরিবেশ**
বিকাশের
অর্থনৈতি
জন্য ব্য
বিষয়।
পরিবেশ
এবং বি
করে প
(জ) প্রাকৃতি
সম্পদে
ও পরি
প্রথাগত
পত্রপ
হয়।

মানুষের শরীরে রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয়। যেমন—জল সরবরাহ, উন্নত শহুরে পরিবেশ, জলবায়ু ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের সংস্পর্শ ইত্যাদি।

(ঘ) **মানুষের জীবনে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনশৈলী:** বর্তমান যুগে অধিকাংশ পরিবেশগত সমস্যাই মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধই পরিবেশকে প্রকৃত রূপ দিতে পারে বা বদলে দিতে পারে। সুতরাং মানবিক নীতিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বাস্তুতন্ত্র, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কারিগরি দিকের বিশ্লেষণ—এসব কিছুই পরিবেশ শিক্ষার আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে।

(ঙ) **আইন:** প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণের জন্য মানুষের মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা বা চর্চা করা আজকাল কঠিন হয়ে পড়েছে। সুতরাং পরিবেশ সম্পর্কিত আইন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম কড়া আইন তৈরি করা দরকার যাতে মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করতে না পারে। এই জন্যই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনও এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) **সম্পদ:** পরিবেশ শিক্ষা বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উৎস, যেমন—তেল, কয়লা, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ, মাটি, জল, শক্তি বন্যপ্রাণী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় এইসব সম্পদের গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সেইসব প্রক্রিয়াগুলি, সম্পদের মান খারাপ হয়ে যাওয়ার সমস্যাসমূহ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিভিন্ন রীতি পদ্ধতিসমূহ, পরিবেশের অবক্ষয়ের প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন পন্থা, যেমন—জমির অবক্ষয় রোধ, পর্যায়ক্রমে শস্য ফলানো পদ্ধতি, বনসৃজন, বিকল্প শক্তি সম্পদের ব্যবহার, যেমন—সৌরশক্তি, জোয়ারভাটার শক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি এসবই নিয়ে আলোচনা করে।

(ছ) **পরিবেশ ও তার উপাদান:** প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ—এসব কিছুই পরিবেশ শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ শিক্ষা প্রাকৃতিক বা জীবভৌতিক পরিবেশ ও মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ উভয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং বিভিন্ন জীব, সেই এলাকার জল, বায়ু, মাটিতে কীভাবে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠন করে পরিবেশ শিক্ষায় তা আলোচনা করা হয়।

(জ) **প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের শনাক্তকরণ:** স্থিতিশীল বিকাশের জন্য পরিবেশের সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রচলিত প্রথাগত (বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি) ও অপ্রচলিত প্রথাগত (সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট ইত্যাদি) শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তদুপরি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী নীতি, আইন প্রণয়ন

ও প্রকল্প গ্রহণ, যেমন—পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ, পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক যোগাযোগ, পরিবেশের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বশীল আচরণ, সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদির উপর পরিবেশ শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পরিবেশ শিক্ষা আমাদের স্মরণ করায় যে আমাদের গ্রহ পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। সুতরাং পরিবেশের প্রতি আমাদের একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটাতে হবে এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অপব্যবহার না করে বা ধ্বংস না করে বা জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট না করে প্রকৃতির সঙ্গে বাস করার চেষ্টা করতে হবে।

7.6.3. পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ মাত্র। যার সংজ্ঞা বিভিন্ন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে একমত। তাঁর মতে, "Education should prepare for complete living which does not mean living in the material sense, nearly but in the widest sense." পরিবেশ শিক্ষার অপর একটি লক্ষ্য হল দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের উন্নতিসাধন করা যার মাধ্যমে পরিবেশ ও তার উপাদানগুলিকে নিরাপদ রাখা, তার সংরক্ষণ করা ও উন্নতিবিধান করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। এইজন্য National Strategy of Environmental Education অনুসারে পরিবেশ শিক্ষার তিনটি ধারা উল্লেখযোগ্য—

- **পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা (About the environment):** প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানমূলক ও বোধমূলক ধারণা দিতে হবে। পরিবেশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের কাজও মানুষ এবং তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাকে।
- **পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা (Through the environment):** দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশকে বাহন করে শিক্ষার্থীরা কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে ধারণা, বোধ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এটি অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং সক্রিয়তাভিত্তিক। শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিবেশের মধ্যে নিজ পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ, দক্ষতালাভ ইত্যাদির শিক্ষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং ইত্যাদি পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক দক্ষতা ও অভিযানের সাহস জোগায়।
- **পরিবেশের জন্য শিক্ষা (For the environment):** তৃতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দক্ষতা ও মূল্যায়ন ক্ষমতারও উন্নতিসাধন করা যায় পরিবেশের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এটি পরিবেশের উন্নতির জন্য বিস্তৃত পদক্ষেপ। মানুষকে

পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলা যাতে পরিবেশের উন্নতিতে সে সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

1970 খ্রিস্টাব্দে UNESCO-এর সভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পরিবেশ ...ক্ষা বা ভাবনা এক চলমান জীবন্ত পদ্ধতি যা মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কৌশল ...বং তার সৃষ্টিগত দিক থেকে অপর মানুষকে বোঝার চেষ্টার মাধ্যমে বেঁচে থাকার এক ...নন্য উপায়। 1977 খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে রাশিয়ার জর্জেস শহরে UNESCO-এর ...রিচালনায় আর একটি জাতীয় পরিবেশ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সভায় গৃহীত ...দ্ধান্তগুলি হল—

1. পরিবেশ নিজেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অংশ যার মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিষয়গুলি লুকিয়ে থাকে।
2. চলমান জীবন্ত পদ্ধতি যা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থানীয় ছোটো অথবা বড়ো পরিবেশের সমস্যাগুলিকে সাধারণ মানুষের সামনে আনতে হবে, যাতে করে স্কুল পড়ুয়ারাও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারে।
3. স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমস্যার ক্ষেত্রে সবাইকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের জন্য এগিয়ে আসার দাবি জানায়।

লক্ষ্য (Aims): পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্যকে তিনটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

- **জ্ঞানমূলক লক্ষ্য (Cognitive aims):** এর মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্কে জ্ঞান দান করাই প্রধান।
- **নীতিমূলক লক্ষ্য (Normative aims):** এর মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা জাগিয়ে তোলা হয়। এ ছাড়াও এককভাবে বা দলগতভাবে গঠনকারী পরিবেশের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের সাম্যাবস্থায় রাখার চেষ্টা করা হয়।
- **প্রযুক্তি বা ব্যাবহারিক লক্ষ্য (Technical and Applicative aims):** এর মাধ্যমে জীবনধারণের মানকে বিপদমুক্ত, উন্নত বা পুনঃস্থাপনের জন্য দলগতভাবে প্রকল্পের আকারে কাজ করার মনোভাব গড়ে তোলা।

এই লক্ষ্যগুলি গতানুগতিক শিক্ষার বা অপ্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতির চাহিদার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের জৈবিক প্রক্রিয়ার সংকট সৃষ্টি না হয়।

উদ্দেশ্য (Objectives): পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি আমরা 3টি বিশেষ ক্ষেত্রের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে পারি, যথা—

1. জ্ঞানমূলক **উদ্দেশ্য**

(ক) স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধ্যান ও ধারণা গড়ে তুলতে,

(খ) স্থানীয় পরিবেশ তথা দূরবর্তী পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গড়ে তুলতে,

(গ) জৈব ও অজৈব পরিবেশ সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটাতে,

(ঘ) বর্তমান সমাজে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করতে,

(ঙ) অপরিকল্পিত জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে আগামী দিনের কথা ভেবে অপ্রতুল সম্পদ বণ্টনের ধারণা দিতে,

(চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূষণের চিহ্নিতকরণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার করতে,

(ছ) বিভিন্ন সামাজিক দূষণের চিহ্নিতকরণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার করতে,

(জ) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করতে।

2. ক্রিয়ামূলক উদ্দেশ্য

(ক) স্থানীয় ও দূরবর্তী পরিবেশের সামগ্রিক উদ্ভিদজাতীয় ও প্রাণীজাতীয় জীবের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা,

(খ) বিভিন্ন জাতি, উপজাতি বা তাদের ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখানো,

(গ) জীবজগৎকে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে শিক্ষা,

(ঘ) বিশুদ্ধ ও নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সমস্ত মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা,

(ঙ) অপ্রতুল প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদের চিন্তাশীল ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, এবং

(চ) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া।

3. মনঃসঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য

(ক) বনসৃজনে অংশগ্রহণ করা,

(খ) মৃত্তিকা দূষণ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিবারণ করা,

(গ) খাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করা,

(ঘ) নিজের ও আশেপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করা,

(ঙ) মাসে একবার কাছাকাছি গ্রামগুলিকে নিয়ে পরিবেশ ভাবনায় অংশগ্রহণ করা।

এ ছাড়া পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে নীচের বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

- **সচেতনতা (Awareness)**: একক ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি সমগ্র পরিবেশের স্পর্শকাতরতা ও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যার সম্বন্ধে জ্ঞানদানের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সচেতন করে তোলা।
- **জ্ঞান (Knowledge)**: একক ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীকে পরিবেশ সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান, পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও তার জন্য মানুষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে অবগত করা।
- **মনোভাব (Attitude)**: একক ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীকে সামাজিক মূল্যবোধ, পরিবেশের প্রতি সূক্ষ্ম অনুভূতি, পরিবেশকে রক্ষা এবং তার উন্নতিবিধান করার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- **দক্ষতা (Skill)**: একক ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীকে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাসমাধানে যথেষ্ট দক্ষতা লাভে সাহায্য করা।

- **মূল্যায়ন ক্ষমতা (Evaluation power):** একক ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীকে বস্তুতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নান্দনিক এবং শিক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত পরিমাপ ও পরিবেশ পরিকল্পনার মূল্যায়নে সাহায্য করা।
- **অংশগ্রহণ (Participation):** একক ব্যক্তি বা সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার প্রতিকারে যথাযোগ্য সক্রিয়তার মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের মনোভাব গড়ে তোলা।

পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশ সম্পর্কে তার প্রতিকারের ও সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক, জৈবিক, সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বোধগম্যতার সঞ্চার হয় এবং বাস্তব জীবনে এর গুরুত্ব আলোকিত করতে পথপ্রদর্শকের কাজ করে। পরিবেশের অসাম্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সুবিধাজনক বিকাশের পথ প্রশস্ত করা যায়। জীবন ও তার মূল্য সম্পর্কিত গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে। শিশুকে পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত যে জিজ্ঞাস্য ও তার জীবন সম্পর্কিত ঘটনাবলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধানের সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে উৎসাহিত করে। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক প্রগতির হার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তার সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। মানুষ নিজের পরিবেশের কতটা ক্ষতি করে সেই আত্মসমীক্ষার জন্যও পরিবেশ বিষয়ে পাঠ দেওয়া দরকার হয়। সুস্থভাবে জীবনযাপন ও তার অধিকভাবে উন্নতির জন্য দক্ষতা প্রদান করে। দূষণ বা ভাঙন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিবেশে অসাম্যাবস্থা দূরীকরণে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় জ্ঞানেরই সঞ্চার ঘটায়। প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য যে জনসচেতনতা প্রয়োজন, সেই সার্বিক চেতনা তৈরি করার জায়গায় পরিবেশ পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

7.6.4. পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of school in environmental education)

শিক্ষার্থী সারাদিনের অর্ধেক সময় অতিবাহিত করে বিদ্যালয়ে। তাই শিক্ষার্থীর মনে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা বা শিক্ষার্থীদের এই প্রচেষ্টা একক ব্যক্তি হিসেবেও হতে পারে কিংবা বিদ্যালয় থেকে দলগতভাবে পেশাদারি সংস্থার সাহায্যে রাজ্য পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় কোনো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই পরিবেশ সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে পারেন।

একক ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন রূপ পেশাদারি প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে ধারণযোগ্য উন্নয়নের নীতিসমূহকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ ছাড়াও শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন

বেসরকারি সংস্থারও সাহায্য নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সংস্কৃতির যে নিবিড় সম্পর্ক তার বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হতে পারেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা এক্ষেত্রে নিজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন কিংবা অন্যদেরকে তাঁদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানিয়ে বিভিন্ন রকম সংস্থা, জনসাধারণ ও বিদ্যালয়কে পরিবেশ শিক্ষার এক মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন। এই জন্য তাঁরা বিভিন্ন সেমিনারে ও কর্মশালায় যোগদান করবেন ও তার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত তথ্য ও যোগাযোগের কৌশল ও শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করবেন। ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য যেগুলি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকার উদ্দেশ্য হবে বিদ্যালয়কে সমাজের কাছে ধারণযোগ্য উন্নয়নের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

উপরোক্ত সকল কর্মসম্পাদনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজ বা অন্য বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, পেশাদারি সংস্থা, ব্যাবসায়িক সমিতি, বেসরকারি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রকের সাহায্য নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে একটি ব্যাপার ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হয় যেন তাঁদের প্রদান করা উন্নয়নের শিক্ষা বর্তমানের বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছোয়। তা হলেই তাঁদের দ্বারা পরিবার ও বৃহত্তর সমাজজীবনের উন্নতিসাধন সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে ***Carleton*** বলেছেন, "The welfare of human society requires the development for social consciousness in each individual."

1. পরিবেশ শিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ শিশুমনে পরিবেশ ভাবনাকে ভাবিত না করতে পারলে আগামী দিনে নিতান্তই অমূলক।
2. ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতার জন্য কোনো পরিবেশ শিবিরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।
3. বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী, বিতর্ক, কুইজ, নৃত্যনাট্য বা অন্যান্য ধরনের সহপাঠক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকা উচিত।
4. বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ট্রেনিং অথবা দূরবর্তী পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
5. ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি পরিবেশ সংক্রান্ত দেওয়াল পত্রিকা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা উচিত।
6. শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যালয় তথা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্যাকে চিহ্নিতকরণ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার পাঠ্যসূচি থাকা বাঞ্ছনীয়।

7.6.5. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা (Environmental Education through Co-curricular Activities)

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্বের কথা চিন্তা করে তাদের বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কথা আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাবিদই বলেছেন। কারণ পাঠক্রমিক

এবং সহপাঠক্রমিক এই উভয় প্রকারের কাজকর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক ও শারীরিক বিকাশ যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যদিও প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমেই বিদ্যালয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে এই শিক্ষাকে আরও আগ্রহমূলক, প্রয়োগধর্মী ও বাস্তবমুখী করে তোলা সম্ভবপর হয়।

বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা। তাই পরিবেশ শিক্ষাকে কেবলমাত্র জ্ঞানমূলক স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ করে দিতে পারলেই এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সার্থক হবে এবং তা বৃহত্তর সমাজের উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পরিবেশ সমন্বিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের ও আগ্রহবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। পরিবেশ শিক্ষার জন্য যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি আয়োজন করা হবে সেই কার্যাবলির মধ্যে চারটি মৌলিক লক্ষ্য বর্তমান থাকবে—(ক) রোমাঞ্চ, (খ) শিখন, (গ) সক্রিয়তা ও (ঘ) দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক।

পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তর অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় পরিবেশ সমস্যার উপর প্রকল্প দিতে হবে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তথ্যসংগ্রহ, তথ্যের বিন্যাস, সমস্যার তীব্রতা ও তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে ও পরে জীবন তাকে আরও জীবন্ত করে তুলবে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত আনন্দদায়ক ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
- বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষুদ্র মডেলের মাধ্যমে তা জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।
- বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতির সঙ্গো যোগাযোগ রাখতে হবে।
- বিভিন্ন প্রদর্শন ও মিউজিয়ামে বা সংগ্রহশালায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে হবে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত অঙ্কন, প্রবন্ধ লিখন বা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বেসরকারি ব্যবস্থা দ্বারা আয়োজিত পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে।
- পরিবেশ সমস্যাযুক্ত অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা সমস্যার বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।
- বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশ সম্পর্কিত গান, নাটক, লোকগাথা, পুতুলনাচ, কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ইত্যাদির অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র, মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশের প্রতি সচেতন করতে ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এর মূল

উদ্দেশ্য পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন। পাঠ্যপুস্তকের তাত্ত্বিক শিক্ষার ব্যাবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। তাই পরিবেশ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিই ছাত্রছাত্রীদের এই অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড়ো সুযোগ এনে দেয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular Activities) বলতে শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তার বাইরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ও পাঠ সম্পর্কিত যে-কোনো সংগঠিত কার্যাবলিকেই বোঝায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদনা করায় মুখ্য ভূমিকা শিক্ষকের। তিনিই পরিবেশ শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বাইরে ও অভ্যন্তরে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করতে পারেন। এরজন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলির আয়োজন করার বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁর থাকা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, Education Commission দু-ধরনের Educational programme-এর সুপারিশ করেছে, তা হল—

1. National Social Scheme (NSS)
2. Socially Useful Productive Work (SUPW)

এই প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে এবং কখনও নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠানের বাইরে ও ভিতরে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করে থাকে। এগুলি হল—

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে

- NSS ক্যাম্পের মাধ্যমে পরিষ্কার কর্মসূচি।
- NSS ক্যাম্পের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ: ফুল, ফল, পাতাবাহার, ভেষজ উদ্ভিদ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- **কঠিন বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপনা:** জৈব ও অজৈব বর্জ্যপদার্থ পৃথকীকরণ ও তা আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করা। বর্জ্যপদার্থকে কেঁচোসার বা অন্যান্য পদ্ধতিতে কম্পোস্টে পরিণত করে বিদ্যালয় অভ্যন্তরে গাছপালাতে ব্যবহার করা। বাতিল হওয়া কাগজ থেকে মণ্ড তৈরি করে হস্তচালিত কাগজ তৈরি করা ইত্যাদি।
- জল অপচয় রোধ ও স্বাস্থ্যসম্মত জল ও শৌচাগার ব্যবহার।
- বৃষ্টির জল ধরে প্রত্যক্ষ ব্যবহার বা ভূ-জলস্তর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- **আলোচনা ও বিতর্কসভার আয়োজন:** বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগজনিত দূষণ, সম্পদের সংকট, নগরায়ণ, জীববৈচিত্র্যের সংকট ইত্যাদি সমস্যার উপর আলোচনা ও বিতর্কসভার আয়োজন করা যায়। এ ছাড়া পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশ সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে তথ্য আহরণ এবং এই সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে যে সমস্ত নীতি, চুক্তি, কনভেনশন ইত্যাদি হচ্ছে সেই বিষয়ে সকলকে অবহিত করার জন্য আলোচনা সভা, পোস্টার প্রস্তুতকরণ, কার্টুন, হ্যান্ডবিল ছাপানো ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মডেল, প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক, কুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার বিদ্যালয় স্তরে আয়োজন করা।

- **প্রদর্শনী:** ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ ও তার সমস্যা, প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন চার্ট, মডেল ইত্যাদি বিদ্যালয় স্তরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন পালন করা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে

- উদ্যান, বাগিচা ও রাস্তার সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য পরিষ্কার অভিযান।
- জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- পরিবহণজনিত বায়ুদূষণ রোধে অভিযান।
- প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক অভিযান ও জনমত গঠন।
- শহর, গ্রাম, অঞ্চল অথবা জেলা স্তরে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা।
- অঞ্চলের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার ও অপচয় রোধে অভিযান।
- অবস্থাবিশেষে কোনো বিশেষ সমস্যার উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ।
- গ্রাম্য অঞ্চলে রাস্তা তৈরি করা ও আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করা।
- মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা আনতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- জনশিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা আনতে প্রয়োজনে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা।
- পরিবেশ সম্পর্কে আন্তর্বিদ্যালয় স্তরে বিতর্ক, কুইজ, আলোচনা সভার আয়োজন করা।
- শিক্ষামূলক **ভ্রমণ (Excursion):** দূষণের কারণ ও দূষণ প্রতিরোধী প্রযুক্তি, বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন পদ্ধতি, বর্জ্যপদার্থের পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কলকারখানা, ময়লা জল পরিশোধনাগার, পানীয় জল পরিশোধনাগার, শহরের আবর্জনা ফেলার চূড়ান্ত স্থান, আবর্জনা পুনর্ব্যবহারকারী শিল্পসংস্থা, সার প্রস্তুতকরণ শিল্পস্থান ইত্যাদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- **প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির (Nature observation camp):** প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ (উদ্ভিদ, প্রাণী অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ) চেনা, নথিভুক্ত করা, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- **সমীক্ষা পরিচালনা:** সার্বিক পরিবেশের বা কোনো বিশেষ সমস্যার উপর সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়গুলি হতে পারে দূষণ, কীটনাশক দূষণ, স্যানিটেশন সমস্যা, স্কুল ও বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার।

উপরোক্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি ছাড়াও যে সকল ছাত্রছাত্রী মানুষের মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করতে চায়, তারা স্থানীয়, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উপর নানান কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে, যেমন—

- **বিজ্ঞান ক্লাব (Science Club):** ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ ও বাস্তুবাবিদ্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সাহায্য করে। পল্লি অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ, পরিষ্কার অভিযান, সচেতনতা প্রচার অভিযান এবং নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণ, কুসংস্কার অপসারণ এদের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

- **সাংস্কৃতিক সমিতি (Cultural Club):** এইডস, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রচার অভিযান করা, সমাজসেবা এদের প্রধান কাজ। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে বাস্তব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে ও তার মুখোমুখি হতে শেখে।
- **পরিবেশ সমিতি (Environmental Club):** এই সমিতির সদস্যরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার বাইরের পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে নানান কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে। ইউনাইটেড স্টেটসে এরকম একটি উল্লেখযোগ্য ক্লাব হচ্ছে HOME (Helping Our Mother Earth)।
- **আন্তর্জাতিক সমিতি (International Club):** আন্তর্জাতিক সমিতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে ও জানতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ছাত্রছাত্রীরা যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে থাকে।

উপরোক্ত সমিতিগুলি ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার উপর কিছু বিশেষ কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

(ক) EEPP বা পৃথিবী শিক্ষা অংশীদারি কার্যক্রম (The Earth Education Partnership Programme)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন এই EEPP যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল পরিবেশ শিক্ষায় উন্নতিসাধন করা। পরিবেশের বিভিন্ন সাধারণ সমস্যার (স্থানীয় বা সমগ্র পৃথিবীর) উপর পৃথিবীর বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ একযোগে আন্তর্জাতিক প্রকল্প গ্রহণ করে ও তার উপর গবেষণা করে। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিও এতে অংশগ্রহণ করে। এই মডেল স্কুল প্রোগ্রামের কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্য হল—

1. স্থায়ী বা স্থিতিশীল (Sustainable) পরিবেশ ও পরিবেশ নীতি (Environmental ethics) গড়ে তোলার জন্য এবং বিশ্বের প্রকৃত আলোচনার বিষয় ও সমস্যাগুলির প্রতি সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি করা। বিশ্বের প্রকৃত সমস্যাগুলি বা আলোচনার বিষয়গুলি হল—অর্থনৈতিক উন্নতির ভারসাম্য, সামাজিক নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রূপে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদি। পরিবেশগত নীতিগুলি হল—পরিবেশ ও পরিবেশের সম্পদ সম্পর্কে চেতনা, নৈতিকতাবোধ।
2. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ও একযোগে গবেষণা কার্যের সম্ভাবনা তৈরি করা।
3. বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী পরিবেশ গঠন করা।

(খ) শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular activities in Teacher Education Programme)

শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে বিশেষ কয়েকটি হল—

- স্কাউটিং
- শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করা
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি
- সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠান

শিক্ষকদের মধ্যে পরিবেশ ও তার সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই কার্যাবলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও পরিবেশকে জানা ও তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমগ্র সমাজেরই, কিন্তু স্থানীয়, আঞ্চলিক বা দেশীয় স্তরে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, উপরোক্ত কার্যাবলির মাধ্যমেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও সহজতর হবে, যা বিদ্যালয় ও জাতির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবেশ শিক্ষায় আগ্রহ ও তার প্রয়োগ ক্ষমতাকে আরও দৃঢ়তর করা সম্ভবপর হবে।

7.6.6. পরিবেশ সচেতনতা বা সতর্কতা (Environmental Awareness)

পরিবেশ সচেতনতার সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় এটি সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে পরিবেশ সম্পর্কে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং পরিবেশের প্রাথমিক বোধগম্যতা সম্পর্কে ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করে। বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাব্রতী মানুষ ও পরিবেশবিদগণ পুনঃপুন নির্দেশ করেছেন যে, পরিবেশগত বিপর্যয়ের যে-কোনো সমাধানে পরিবেশ সচেতনতা ও গভীর পরিবেশ বোধ প্রয়োজন যা সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। পরিবেশ শিক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা অনেকক্ষেত্রেই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, যদিও এই দুটি বিষয় তাৎপর্যগতভাবে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও কৃষিবিজ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। কিন্তু পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশের কল্যাণবিষয়ক দক্ষতাও প্রয়োগ সংক্রান্ত উন্নতি আলোচিত হয়।

পৃথিবীর জীবনধারক পরিবেশে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের গতিশীল স্থায়িত্ব এবং পুষ্টিসাধন ইত্যাদির পূর্ণ অস্তিত্বের জন্য বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের পরিকাঠামো সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। বাস্তুতন্ত্রের স্বতন্ত্র জীবসমূহ পরস্পরের অধীন অর্থাৎ কোনো জীবই বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি জীবই খাদ্য, বাসস্থান, জৈবিক ক্রিয়া, বিনোদন ইত্যাদির জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যে বাস্তুতন্ত্রের জীববৈচিত্র্য যত বেশি, তার স্থায়িত্ব তত বেশি। কমসংখ্যক জীব সংক্রান্ত ও স্তররেখিত বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব খুবই কম। সুতরাং মানবপ্রজাতির স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য পৃথিবীর জীবনধারণের স্থায়িত্বের সংরক্ষণ আবশ্যক। এই কারণে সব ধরনের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন।

1975 খ্রিস্টাব্দের বেলগ্রেড ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবেশ শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে বিশ্ব জনমানবকে পরিবেশ সম্পর্কে বোধগম্যতা প্রদানের কথা

আলোচিত হয়েছে। পরিবেশ সচেতনতার বিস্ফোরণ বিশ্ব জনগণের কাছে পরিবেশের সমস্যাসমাধানে শক্তির জোগান দেবে, এমনটি ভাবা হয়েছে। এই ওয়ার্কশপের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবেশ সচেতনতাকে উন্নত করার প্রক্রিয়াগুলি হল—

- ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি বিশেষ করে স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও বোধগম্যতার প্রয়োজন।
- সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে পরিবারভিত্তিক, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শহর ও গ্রামভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।
- জাতীয় স্তরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।

United Nations Conference of Human Environment (Stockholm, June 1971)-এর সুপারিশ অনুসারে, বিভিন্ন অন্তর্দেশীয় প্রোগ্রাম, যেমন, United Nations Environmental Programme (UNEP) নানান সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার সুফল হচ্ছে এবং বলা হয়েছে, পরিবেশ সচেতনতা নিম্নলিখিত উপায়ে গড়ে তোলা যায়।

(ক) ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন ও স্বাস্থ্য ও জীবিকা সম্পর্কিত সমস্যা শনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ ও বোঝার মাধ্যমে,

(খ) পরিবার, শ্রেণি, সম্প্রদায়, ধর্ম, শহর বা গ্রামাঞ্চল, রাজ্য বা দেশ—সমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক জীবনকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে,

(গ) অর্থনৈতিক, অসামরিক ইত্যাদি জাতীয় জীবনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে,

(ঘ) পরিবেশের উন্নতি ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জীবিকা, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া,

(ঙ) বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক সংগঠনের সাহায্যে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে,

(চ) সৌন্দর্যবোধ তৈরি করে তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গ্রহণের মাধ্যমে।

মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা জাগাতে বা সঞ্চার করতে পরিবেশ শিক্ষা একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পরিবেশ সচেতনতা প্রধানত দুটি উপায়ে অর্জন করা যায়—(a) প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা এবং (b) অপ্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা।

(a) প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা (Awareness through Formal Education): পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা এবং পরিবেশ বিজ্ঞানসমূহ, যেমন—পরিবেশ দূষণ, বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

(b) অপ্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা (Awareness through Non-formal Education): সমাজে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে, যথা—শিশু, কিশোর,

প্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষক, প্রশাসক প্রভৃতির মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এই অপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা সর্বাধিক উপযোগী। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে অপ্রচলিত প্রথার সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান হল বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন—সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, বেতার, দূরদর্শন, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানা, প্রাকৃতিক সংগ্রহশালা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি যা জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং উন্নতিবিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা: পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে দিয়ে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আদানপ্রদান, কথোপকথনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। নিম্নলিখিত কার্যাবলির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়।

- বিদ্যালয়ে উন্নত ধরনের স্যানিটারির ব্যবস্থা করা,
- বিদ্যালয় গৃহ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা,
- বর্জ্য পদার্থের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা,
- নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বায়ু ও জলদূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা,
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের শরীর পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ রাখা,
- বিদ্যালয়ে খেলাধুলার পরিবেশ গড়ে তোলা,
- শিক্ষার্থীদের তথ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা,
- শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং অপব্যবহার সম্পর্কে অবগত করা,
- সম্ভব হলে পরিবেশ সংক্রান্ত একটি বাৎসরিক পত্রিকার ব্যবস্থা করা,
- পরিবেশ সম্পর্কে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখা এবং খবরের কাগজ পড়তে উৎসাহ প্রদান করা,
- বনসৃজন, অরণ্যসপ্তাহ পালন ইত্যাদি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলা, এবং
- শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ বিদ্যার অনুবন্ধ গঠন করা।

7.6.7. পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Environmental Education and Environmental Awareness)

পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—

পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে উন্নত ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা, পরিবেশ সচেতনতা

- পরিবেশ শিক্ষা হল জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশের ভৌত ও যৌথ উপাদানগুলি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করে।
- পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে মানুষের যৌথ, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্পর্ক যুক্ত, অপরপক্ষে পরিবেশ সচেতনতা প্রাকৃতিক, জৈবিক ও ভৌত পরিবেশের ধারণা প্রদানের পদ্ধতি মাত্র।

- জীবনের মানোন্নয়ন, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটাতে পরিবেশ শিক্ষা প্রধান কার্যকরী ও উৎপাদনধর্মী ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশের ভৌত ও জৈব উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে থাকে।
- পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে মানুষের ভৌত, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের তথা সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন। অপরপক্ষে, সময়কাল, স্থান, পার্থিব জগৎ ও মানবিক দিককে শনাক্ত করতে, পরিবেশের বিভিন্ন জীবের ভৌত, প্রাকৃতিক ও জৈবিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে পরিবেশ সচেতনতা তথ্য সরবরাহ করে।
- পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও মনোগত পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোনো সংস্থার পরিবেশ ও সমৃদ্ধি, সংস্থার মনোবৈজ্ঞানিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একইভাবে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবেশেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের মানসিকতা দ্বারা রচিত হয়। পক্ষান্তরে, পরিবেশ সচেতনতা বিষয়টি জীবের ভৌত ও জৈবিক উপাদান এবং বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক বা বোঝাপড়া সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করে।
- পরিবেশ শিক্ষা মানুষের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলির জন্য সহায়ক পরিবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অপরপক্ষে, পরিবেশ সচেতনতা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্য-পরিবর্তিত পরিবেশ সম্পর্কে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান সরবরাহ করে।
- পরিবেশ শিক্ষা সমগ্র স্তরে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য কর্মপন্থা ও কর্মোদ্যোগ পালনের নিমিত্ত সুযোগ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে, পরিবেশ সচেতনতা পরিবেশ সমস্যা ও তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সীমাবদ্ধ। এখানে সমাধানের জন্য কোনো কর্মপন্থা বা কর্মোদ্যোগ গৃহীত হয় না।
- পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে আন্তঃবিনিময় ঘটায়। এই ধরনের আন্তঃবিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা কার্যকরী হয়ে ওঠে।
- পরিবেশ শিক্ষার তাত্ত্বিক ব্যাবহারিক উভয় প্রকার প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতার শুধু তাত্ত্বিক প্রয়োগ সম্ভব।